POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

এবং যদি শয়তানের পক্ষ হইতে কোন প্ররোচনা তোমাকে আক্রমণ করে তাহা হইলে তুমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় ভিক্ষা কর,নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা,সর্বজ্ঞানী।

(আল আরাফ: ২০১)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 10

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 39

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 25 Sep, 2025 2 রবিউল সানি 1447 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

সফরকালে বিলম্বে নামায জমা করা

১০৯১) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত: আমি রসুলুল্লাহ্ (সা.) কে দেখেছি, যখন সফরে তিনি শীঘ্রই যাওয়ার পরিকল্পনা করতেন, তখন তিনি মগরিব ও এশার নামাযে দেরি করতেন এবং উভয় নামাযকে একত্রে পড়তেন। সালিম বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ (বিন উমর) ও এমনটাই করতেন, যখন তারা শীঘ্র সফরে যাওয়ার পরিকল্পনা করতেন।

আঁ হযরত (সা.) ফরজ নামাযের জন্য বাহন থেকে নেমে যেতেন।

১০৯৭) হযরত আমির বিন রাবিয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রসুলুল্লাহ্ (সা.)কে দেখেছেন, উটের উপর নফল নামায পড়তে। তিনি (রুকু ও সিজদা) মাথার ইঙ্গিতে করছিলেন। তাঁর অভিমুখ সেদিকেই ছিল যেদিকে উট হেঁটে চলেছিল। রসুলুল্লাহ (সা.) ফরজ নামাযের ক্ষেত্রে এমনটা করতেন না।

মানুষ অধিকাংশ বিষয়ে ঝগড়া করে।

১১২৭) হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেছেন যে রসুলুল্লাহ্ (সা.) এক রাতে তাঁর এবং রসুল তনয়া হযরত ফাতিমা (রা.) এর কাছে এসে বলেন- 'তোমরা কি (তাহাজ্জুদের) নামায পড় না?' আমি বললাম, 'হে রসুলুল্লাহ! আমাদের প্রাণ আল্লাহ্ তা'লার হাতে আছে; তিনি যেদিন ইচ্ছে করেন আমাদেরকে ঘুম থেকে তুলে দেন। আমি একথা বললে তিনি ফিরে গেলেন, কোন উত্তর করলেন না। তিনি যখন ফিরে যাচ্ছিলেন, আমি তাঁকে দেখেছি নিজের উরু চাপড়াচ্ছিলেন আর বলছিলেন- 'মানুষ অধিকাংশ বিষয়ে ঝগড়া করে।'

(বুখারী, ৪র্থ খণ্ড)

খোদা তা'লা ব্যতিরেকে জীবন অতিবাহিত করাও এক প্রকার জাহান্নাম। মানুষ এই সব রোগব্যধি ও বিপদাপদে আক্রান্ত হয় কারণ সে খোদা থেকে দুরে সরে গিয়ে খোদার সামনে ঔদ্ধত্যপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করে, সে খোদা তা'লার কথাকে সম্মান দেয় না কিম্বা গ্রাহ্য করে না। সেই সময় এক প্রকার জাহান্নাম সৃষ্টি হয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

দুটি বস্তুর পরস্পরের ঘর্ষণের ফলে উত্তাপ তৈরী হয়। অনুরূপভাবে মানুষের ভালবাসা এবং জগত এবং জগতের বস্তুসমূহের ভালবাসার ঘর্ষণের ফলে ঐশী ভালবাসা পুড়ে যায় এবং হৃদয় অন্ধকার হয়ে খোদা থেকে দূরে সরে যায় এবং যাবতীয় প্রকারের অস্থিরতার শিকার হয়ে যায়। কিন্তু যখন জাগতিক বস্তুর সঙ্গে যে সম্পর্ক থাকে তা খোদার মধ্যে বিলীন হয়ে একক সম্পর্ক তৈরী হয় এবং এদের ভালবাসা খোদার ভালবাসায় বিলীন হয়ে যায় , সেই সময় পারস্পরিক ঘর্ষণের ফলে গায়রুল্লাহ্‌র ভালবাসা ভস্মীভূত হয়ে যায় এবং এর স্থানে জ্যোতি পূর্ণ হয়ে যায়। এই অবস্থাতে পৌঁছেই খোদার ভালবাসার তার জন্য গন্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। আর যেভাবে জীবন ধারণের অনুষঙ্গ রয়েছে,সেই জীবনের জন্য কেবল খোদারই প্রয়োজন হয়। ভিন্নবাক্যে বলা যায় যে, খোদার মাঝেই তার আনন্দ ও পরিতৃপ্তি। অতঃপর জগত সর্বস্ব ব্যক্তিদের কাছে যদি কোন দুঃখ ও কষ্ট পায় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই দুঃখ-কষ্টের মাঝেও সে শান্তি ও স্থবিরতা থেকে ঐশী সুখানুভব লাভ করে যা কোন দুনিয়াদারের দৃষ্টিতে বড় বড় সফল ব্যক্তিদের ভাগ্যে জোটে না।

এর বিপরীতে খোদা তা'লা ও মানুষের মাঝের যে পরিস্থিতি থাকে তা জাহান্নাম। অর্থাৎ খোদা তা'লা ব্যতিরেকে জীবন অতিবাহিত করাও এক প্রকার জাহান্নাম।

এছাড়া হাদীস থেকেও জানা যায় যে, জ্বরও এক প্রকার উত্তাপ বা জাহান্নাম। মানুষ যে নানান প্রকারের রোগব্যাধি ও বিপদাপদে নিপতিত হয় সেটাও জাহান্নামের নিদর্শন। এটা এ কারণে যে, মানুষ যাতে কিছুটা হলেও পরকালের বিষয়টি প্রত্যক্ষ করতে পারে এবং এগুলো ঐশী প্রতিদান ও শাস্তির বাস্তবতার বিষয়ে সাক্ষীপ্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত হয় আর প্রায়শ্চিত্যবাদের মত জঘন্য ধর্মবিশ্বাসের অপনোদন হয়। যেমন কুষ্ঠ রোগীকেই দেখুন, যেখানে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পচন ধরে এবং এক প্রকার তরল ক্ষরণ হয়। মানুষের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে আসে। এটাও এক প্রকারের জাহান্নাম। মানুষ তখন এমন রুগীকে ঘৃণা করে এবং ছেড়ে পালায়। সব থেকে কাছের তার স্ত্রী, সন্তান এমনকি মা-বাবা পর্যন্ত তার থেকে দূরে সরে যায়। অনেকে অন্ধ ও বধির হয়ে যায়। আরও অনেক মারাত্মক ব্যধিতে মানুষ আক্রান্ত হয়। অনেকের পেটে পাথর হয়, টিউমার হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, মানুষ এই সব রোগব্যধি ও বিপদাপদে আক্রান্ত হয় কারণ সে খোদা থেকে দূরে সরে গিয়ে খোদার সামনে ঔদ্ধত্যপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করে, সে খোদা তা'লার কথাকে সম্মান দেয় না কিম্বা গ্রাহ্য করে না। সেই সময় এক প্রকার জাহান্নাম সৃষ্টি হয়।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫০৩-৫০৪)

কাফেররা আশ্চর্যান্বিত ছিল যে, তাদের মধ্য থেকে একব্যক্তির উপর কিভাবে ওহী হল? একই অবস্থা বর্তমান যুগের অনেক মুসলমানদের।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা ইউনুসের ৪ নং আয়াত- أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন- কাফেররাআশ্চর্যান্বিত ছিল যে, তাদের মধ্য থেকে একব্যক্তির উপর কিভাবে ওহী হল! অধঃপতিত জাতির মধ্যে এই চেতনা কাজ করে যে তাদের মধ্যে কোনও বড় সত্তা সৃষ্টি হতে পারে না। অর্থাৎ কাফেররা নিজেদের বিষয়ে এতটাই আশাহত হয়ে পড়েছিল যে, তাদের চিকিৎসা যে তাদের মধ্যেই বিদ্যমান সেকথা তারা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। তাদের ধারণা ছিল, তাদের উন্নতি এবং সমৃদ্ধির এবং চিকিৎসার জন্য বাইরে থেকে কারো আসা উচিত। একই অবস্থা বর্তমান যুগের অনেক মুসলমানদের। তারাও একথা বলে যে, হযরত ঈসা (আ.) আকাশ থেকে নেমে এসে আমাদেরকে লাঞ্ছণা এবং পশ্চাদপদতা থেকে বের করবেন- আমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তির জন্ম হতে পারে না যে আমাদের চিকিৎসা করবে। এবিষয়টিতে পূর্ববর্তী জাতিগুলির সঙ্গে তাদের কিরূপ সামঞ্জস্য রয়েছে - সেই একই নিরাশা আর একই চিকিৎসার উপায়!

যারা জাতির উন্নতির জন্য হয় কোন উৎসাহ রাখতেন না, কিম্বা মনে করতেন, বাহ্যিক চিকিৎসা ছাড়া কিছুই হতে পারে না, যখন তাদের মধ্য থেকেই তাদের ভাই দাবি করল, 'আমি তোমাদের চিকিৎসা করব আর তোমাদেরকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাব, তখন তাদের বিস্ময়ের অবধি ছিল না। তারা আশ্চর্যচকিত ছিল যে, যে বিষয় সম্ভব ছিল না তা সম্ভব করার দাবি এ কিভাবে করল?

দ্বিতীয় যে বিষয়টি তাদের জন্য আশ্চর্যের ছিল তা হল, এই দাবিদার দাবি করছে যে, তাকে মানুষকে সতর্ক করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ কিছু পুরোনো কথা ত্যাগ করে কিছু নতুন

(এরপর শেষের পাতায়.....)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

কেউ তো আর চব্বিশ ঘন্টা কাজ করে না। কোন না কোন সময় তো অবশ্যই পাওয়া যায়। সপ্তাহান্তে ছুটি তো অবশ্যই পাওয়া যায়। এই সব দেশে সপ্তাহান্তের ছুটিও থাকে। তাই ওভারটাইম করার সপ্তাহান্তের ছুটিকেও যদি রোজগার করার কাজে লাগিয়ে দাও তবে এর লাভ কি? তাদের উচিত সপ্তাহে অন্তত দুই-এক দিন জামাতের জন্য উৎসর্গিত করা।

ইমাম জামাত আহমদীয়া হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) এর সঙ্গে ফিনল্যান্ডের ওয়াকফে নওদের অনলাইন সাক্ষাত

ইমাম জামাত আহমদীয়া হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) ১৮ই ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে ফিনল্যান্ড-এর ১০ বছর এবং তদোর্ধ্ব বয়সের ওয়াকফে নও ছেলে ও মেয়েদের সঙ্গে অন-লাইন সাক্ষাত করেন।

সাক্ষাতে হুযুর তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। প্রশ্নোত্তরগুলি উপস্থাপন করা হল।

প্রশ্ন: একজন ওয়াকফে নও প্রশ্ন নিবেদন করে যে, যে সব ওয়াকফে নও ছেলেরা পড়াশোনা ছেড়ে দেয় বা পড়াশোনা শেষ করার পর নিজেদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, ওয়াকফ-এর বিষয়ে জামাতকে কিছুই জামাতকে কিছুই জানায় না, এমন ওয়াকফীনে নওদের প্রতি হুযুরের কি উপদেশ থাকবে?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, মা-বাবা যখন সন্তানকে ওয়াকফ করেছে, সেক্ষেত্রে তারা সন্তানকে এই শিক্ষা দিবে যে পনেরো বছর হওয়ার পর তারা নিজেরাই জামাতকে বন্ড বা চুক্তির নবায়ন করার জন্য এগিয়ে আসবে আর বলবে যে তারা পনেরো বছরের হয়ে গিয়েছে, এখন পড়াশোনা করছে, পড়া শেষ হলে জামাতের কাজের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করবে। নীতিগতভাবে এমনটা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এরপর ২১-২২ বছরে যখন ইউনিভার্সিটির পড়াশোনা শেষ করে তখন পুনরায় জানিয়ে দেওয়া উচিত যে, পড়াশোনা শেষ হয়েছে আর এখন এই কাজ করেছি, এখন আমার জন্য কি করণীয়? তাই নীতিগতভাবে এটি একটি অঙ্গীকার যা মা-বাবা নিজেদের সন্তানদের বিষয়ে জামাতের সঙ্গে করে থাকে আর সেই অঙ্গীকার পূর্ণ করা উচিত। এরপর সন্তান সেই অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। যদি সন্তান কাজ না করতে চায়, জামাতের সেবা করতে না চায়, তবে সরাসরি লিখে জানিয়ে দেওয়া উচিত যে, আমার মা-বাবা ওয়াকফ করেছিল, কিন্তু আমাদের পরিস্থিতির কারণে আমি এমনটি করতে চাই না। তাই নীতিগতভাবে সততারও দাবি এই যে, যখন পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখে, তখন নিজের কাজের জন্য অনুমতি নিক, মরকযকে জানাক যে, আমি পড়াশোনা করেছি, এখন আমি নিজের কাজ করব না কি মরকয আমার থেকে কোন সেবা নিতে চাই। মরকয প্রায় একথাই বলে দেয় যে, তোমরা নিজের কাজ কর। আর যারা মাঝেই পড়াশোনা ছেড়ে দেয়, অকর্মা হয়ে থাকে, তাদের তো এমনিতেই ওয়াকফ ছেড়ে দেওয়া উচিত এবং জানিয়ে দেওয়া উচিত এবং জানিয়ে দেওয়া উচিত যে সে কোন পড়াশোনা করে নি আর এখন সে কি করবে? কেননা, শিক্ষিত লোকই আমাদের প্রয়োজন, ওয়াকফে নও হিসেবে অশিক্ষিত আমাদের দরকার নেই। তাই সততার দাবি হল তাদের জানিয়ে দেওয়া যে, তাদের মা-বাবা অঙ্গীকার করেছিল যে, এই অঙ্গীকার পূর্ণ করার জন্য তোমরা ১৫ বছর বয়সে নিজেদের চুক্তির নবায়ন করবে এবং ২১ বছর বয়সে পুনরায় নবায়ন কর এবং এ বিষয়ে নিয়মনিষ্ঠ থাক।

প্রশ্ন: কিছু ওয়াকফীন যারা ওয়ার্ক ভিসা কিম্বা অস্থায়ী ভিসা নিয়ে এখানে থাকে আর এই সব দেশে থাকার জন্য তাদেরকে কাজ করতে হয়, তারা কিভাবে নিজেদেরকে ওয়াকফীন হিসেবে পেশ করবে আর জামাতের সেবা করবে?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, কেউ তো আর চব্বিশ ঘন্টা কাজ করে না। কোন না কোন সময় তো অবশ্যই পাওয়া যায়। সপ্তাহান্তে ছুটি তো অবশ্যই পাওয়া যায়। এই সব দেশে সপ্তাহান্তের ছুটিও থাকে। তাই ওভারটাইম করার সপ্তাহান্তের ছুটিকেও যদি রোজগার করার কাজে লাগিয়ে দাও তবে এর লাভ কি? তাদের উচিত সপ্তাহে অন্তত দুই-এক দিন জামাতের জন্য উৎসর্গিত করা। আমরা যদি সপ্তাহান্তের একদিন ওভার টাইম করি আর এক দিন জামাতকে দিই তবে জামাতের যে কাজ থাকবে তা আপনার সোপর্দ করতে পারবে। এটাই বাস্তব। এখানে আপনারা কিভাবে এসেছিলেন? স্টুডেন্ট ভিসায় এসেছিলেন? (তারা উত্তর দেয়, জ্বী হুযুর)। হুযুর আনোয়ার বলেন, পাকিস্তান ছেড়ে এখানে স্টুডেন্ট ভিসায় একারণে এসেছিলেন উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে কিম্বা সেখানে আপনাদের জন্য শিক্ষার সুযোগ ছিল না। এইজন্যই তো এসেছিলেন। শিক্ষার সুযোগ কেন ছিল না? (তারা উত্তর দেয়, যেভাবে এখানে আমরা স্বাধীনভাবে শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছি সেটা ওদেশে পাওয়া যেত না) হুযুর আনোয়ার বলেন, স্বাধীনভাবে নিজেদেরকে আহমদী পরিচয় দিয়ে এখানে থাকতে পারেন, অপরদিকে সেখানে লুকিয়ে ভয়ে ভয়ে থাকতেন। এর অর্থ আহমদীয়াতের কারণে আপনারা এখানে এসেছেন, শরণার্থী হিসেবে হোক বা শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে হোক, যেহেতু পাকিস্তানে ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল না। অতএব, যে ধর্মের নামে এখানে এসেছেন, সেই ধর্মেরও কিছু অধিকার বর্তায়। তাই আমি বলন, সপ্তাহে এক দিন করে অবশ্যই জামাতকে দিন। সততা এবং নৈতিকতার এটিই দাবি। বাকি আপনার ইচ্ছে।

প্রশ্ন: কেউ কেউ দাবি করে, 'কারো হয়তো খারাপ লাগতে পারে, আমরা কেবল স্পষ্ট কথাই বলি। ' এমন মানুষ অনেক সময় এমন কথা বলে বসে যা অন্যদের অনেক কষ্ট দেয়। হুযুর! এই পন্থা কি সঠিক?

হুযুর আনোয়ার বলেন, কথা হল, কেবল স্পষ্ট কথা বলা কৃতিত্বের কিছু নয়। আরব বেদুইনরাও স্পষ্টবাদী ছিল। তাদের বিষয়ে আমরা কি বলি? তাদেরকে আমরা বেদুইনই বলে থাকি, শিক্ষিত তো আর বলি না। যে বেদুইন হযরত উমর (রা.) কে ধরে টেনে ধরত, তাকে তো আমরা মহান সাহাবী বলি না। যে এমন কাজ করে তাকে তো আমরা অজ্ঞ ও উন্মাদ ব্যক্তিই বলে থাকি। হযরত উমর এবং সেই সব পুণ্যবান সাহাবারা নিজেদের ধৈর্য ও মহানুভবতার কারণে এই ধরণের কাজ সহ্য করে নিতেন। কিম্বা যে ব্যক্তি আঁ হযরত (সা.)-এর গলায় চাদর দিয়ে টানতে শুরু করেছিল সে কি বুদ্ধিমানের কাজ করেছিল? তার কাজ তো পাগলের মতই ছিল। কিন্তু আঁ হযরত (সা.) সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। তাই এগুলো অজ্ঞতাপূর্ণ কাজ, আর অজ্ঞদের কথা সহ্য করা উচিত। আর বড়দের প্রতি সম্মান দিয়ে কথা বলা,বা তাদের কথার উত্তর দেওয়ার বুদ্ধিই থাকে না। তারা তাদের কথা বোঝার চেষ্টা করে না বা তাদেরকে বোঝানো হলে নিজেদেরকে বড় মনে করে। আর ছোটদের বোঝানোর ক্ষেত্রে সদিচ্ছা থাকা দরকার। এটাই নৈতিকতা। আর এমন সময় বোঝানো উচিত যখন তারা বুঝতে পারে, উল্টে প্রতিক্রিয়া না দেখায়। বড়দের মধ্যে কেউ কেউ যুবকদেরকে প্রকাশ্যে বলে দেয়। পাঞ্জাবীতে বলে, তুমি এমন কাজ কেন করেছ, তুমি অনর্থক কাজ কর তোমরা এমন কাজ কেন কর-ইত্যাদি ইত্যাদি বলে বকাঝকা করে। এতে সেই যুবকের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। সে বলে, আমাকে লোকের সামনে অপমান করল, আমি তার কথা মানব না। কোন কর্মকর্তা এই কাজ করলে সে তখন মসজিদ আসাই বন্ধ করে দেয়। তাই এসব কাজ দূরে সরিয়ে দেওয়া আর অজ্ঞতাপূর্ণ আচরণ। তাই যদি বোঝাতেই হয়, তবে সবসময় সদিচ্ছা সহকারে বোঝানো উচিত, মানুষ যেভাবে নিজের সন্তানকে পৃথক নিয়ে গিয়ে বোঝায় যে, এটা খারাপ কথা। মানুষ সচরাচর নিজের সন্তানের বিষয়টা মাথায় রাখে। অনেকে আবার লোকের সামনে ছোটদেরও ভীষণ বকাঝকা করে, এমনকি নিজেদের বাচ্চাদেরও। কিন্তু নিজের সন্তানের প্রতি আচরণ কিছুটা হলেও পৃথক হয়ে থাকে। এটা অন্যায়। যদি কোন যুবককে বোঝাতে হয় তবে বড়দেরও উচিত সেই যুবকের আত্মসম্মানের প্রতি সংবেদনশীল থেকে তাকে বোঝানো। আর যদি ছোটরা বড়দের সঙ্গে কথা বলে তবে তাদেরও উচিত শিষ্টাচার বজায় রেখে বড়দের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি যত্নবান থাকা, অজ্ঞদের ন্যায় সামনের জনের কথা না শুনে মুখে যা আসে তাই বলে ফেলা উচিত নয়। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, এটা উন্নত নৈতিকতার ভিত্তি। নম্রতা সহকারে একে অপরের প্রতি উন্নত আচরণ করা উচিত, বেদুইন ও অজ্ঞদের ন্যায় মুখে যা আসে তাই বলে ফেলা উচিত নয়।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" তুচ্ছ এ জীবন যাকে নিয়ে এত গর্ব করা হয়। চিরন্তন আনন্দের জীবন সেটিই যা মৃত্যুর পর লাভ হয়।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

জুমআর খুতবা

মহানবী (সা.)-এর মহান চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ প্রণিধানযোগ্য যে, তিনি (সা.) মক্কা বিজয় করে নিয়েছিলেন। এখন এটি একটি বিজীত জাতি ছিল আর যুদ্ধনীতি অনুযায়ী বিজয়ীরাই বিজিত জাতির সমস্ত ধনসম্পদের মালিক হয়ে থাকে। কিন্তু যুদ্ধের জন্য যখন অস্ত্রের প্রয়োজন দেখা দেয় তখন প্রতিটি অস্ত্র ধার নেওয়া হয়। আর এই অঙ্গীকার করা হয় যে, আমরা যতগুলো অস্ত্র নিচ্ছি ঠিক ততগুলো ফেরত দেবো।

হুনাইনের যুদ্ধের আলোকে মহানবী (সা.)-এর অনুপম আদর্শ

মাননীয় খওজা মুখতার আহমদ বাট (কানাডা) এবং ভারতের নাযির আহমদ সাহেবের সহধর্মীনী মাননীয় সাঈদা বেগম সাহেবার স্মৃতিচারণ ও জানাযা গায়েব

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২২ আগস্ট, ২০২৫, এর জুমুআর খুতবা (২২ জহুর, ১৪০৪ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,মহানবী (সা.)-এর সীরাত বা জীবনীর আলোকে যুদ্ধ অথবা লড়াইসমূহের আলোচনা হচ্ছিল। এই প্রসঙ্গেই আজ হুনাইনের যুদ্ধেরও উল্লেখ করব। এই যুদ্ধ অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল। এটিকে হুনাইনের যুদ্ধ কেন বলা হয়- তার কারণ হলো, হুনাইন হচ্ছে মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি জনপদের নাম, যা মক্কা থেকে প্রায় ছাব্বিশ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থি ত। এই যুদ্ধ সেই স্থানেই হয়েছিল, তাই একে হুনাইনের যুদ্ধ বলা হয়। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বড়ো গোত্র ছিল হাওয়াযিন, তাই একে হাওয়াযিনের যুদ্ধও বলা হয়। কেউ কেউ একে আওতাসের যুদ্ধও বলেছেন; কারণ শত্রুবাহিনীর একটি অংশ হুনাইন থেকে পালিয়ে আওতাস নামক উপত্যকায় চলে গিয়েছিল এবং মুসলমানরা সেখানে পৌঁছে শত্রুদের পরাজিত করেছিল, তাই কেউ কেউ এই নাম দিয়েছেন। যদিও অধিকাংশ লেখক আওতাসের অভিযানের উল্লেখ পৃথকভাবে করেছেন।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫১) (গাযওয়াতুন নবী, প্রণেতা- আল্লামা বুরহানুদ্দীন হালবি, পৃ: ৬২৩) [দায়েরায়ে মারেফ সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.),৯ম খণ্ড, পৃ: ২২১] (তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ১১৪)

হুনাইনের যুদ্ধের উল্লেখ পবিত্র কুরআনে এভাবে এসেছে:

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۙ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ - ثُمَّ أَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَأَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ - ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - (التوبۃ:25تا27)

অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অনেক ক্ষেত্রে তোমাদের সাহায্য করেছেন এবং বিশেষত হুনাইনের দিনেও, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে অহংকারী করে তুলেছিল, কিন্তুতা তোমাদের কোনো কাজেই আসে নি। আর পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্যতা সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তখন তোমরা পিঠ দেখিয়ে পালিয়েছিলে। এরপর আল্লাহ্ তা'লা তাঁর রসূল ও মুমিনদের ওপর স্বীয় প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন এবং এমন সৈন্যদের অবতীর্ণ করেন যাদেরকে তোমরা দেখতে পাচ্ছিলে না। আর যারা অস্বীকার করেছিল তাদেরকে তিনি শাস্তি দেন, আর অস্বীকারকারীদের প্রতিফল এরূপই হয়ে থাকে। আর এরপরও আল্লাহ্ যার ক্ষেত্রে ইচ্ছা তওবা কবুল করে ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, বার বার কৃপাকারী।' (সূরা আত-তাওবা: ২৫-২৭)

এর কারণ এটি হয়েছিল যে, মক্কা যখন বিজিত হয়- তখন পর্যন্ত আরবের বড়ো বড়ো গোত্রসমূহ হয় ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিল, নতুবা মহানবী (সা.)-এর বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু মক্কার কাছেই বসবাসকারী বনু হাওয়াযিন ও বনু সাকীফ গোত্র, যারা অত্যন্ত উদ্ধত ও যুদ্ধবাজ গোত্র ছিল- তারা শুধু আনুগত্য স্বীকার করতেই অস্বীকার করে নি,বরং তাদের নেতারা একত্রিত হয়ে বলতে থাকে, মুহাম্মদ (সা.) মক্কাসহ আরবের গোত্রসমূহকে নিজের অনুগত ও অধীন বানিয়ে নিয়েছেন। এখন নিশ্চয়ই তিনি আমাদের দিকে অগ্রসর হবেন। তাই উত্তম হলো, তারা আমাদের দিকে এগোনোর আগেই আমরা নিজেরাই তাদের ওপর আক্রমণ করব। [অর্থাৎ, তারা নিজেরাই এটি ধারণা করে নেয়।] আর এটিও বলতে থাকে যে, মুহাম্মদ (সা.) এখন পর্যন্ত অনভিজ্ঞ লোকদের মুখোমুখি হয়েছে, আমাদের সাথে এ পর্যন্ত তাদের সংঘাত হয় নি। বনু হাওয়াযিনের সাথে সাকীফ, নসর ও জুশাম গোত্রের সকল যোদ্ধা যোগ দেয়। সা'দ বিন বকর ও বনু হিলাল গোত্র থেকেও কিছু লোক যোগ দেয়।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩১০)

কতক বর্ণনা থেকে জানা যায়, বনু হাওয়াযিন প্রকৃতপক্ষে এর অনেক আগে থেকেই মুসলমানদের মোকাবিলা করার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিল। কারণ তারা যখন দেখল, মুহাম্মদ (সা.) ধীরে ধীরে ইহুদীসহ অন্যান্য গোত্রকে নিজের অধীনস্থ করে চলেছেন, তখন তারা এই ভেবে উদ্‌বিগ্ন হয় যে, মূর্তিপূজা একেবারে নিশ্চিহ্ন না হয়ে যায় আর মুহাম্মদ (সা.) তাঁর সাথিদের নিয়ে সবার ওপর জয়ী না হয়ে যান! তাই তাদের পথ রোধ করা আবশ্যক। অতএব এর জন্য তারা প্রস্তুতি শুরু করে দেয় এবং উরওয়া বিন মাসউদের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল জর্ডানের জুরুশ শহরে পাঠায় যেন সেখান থেকে অস্ত্র ও যুদ্ধের সরঞ্জামাদি নিয়ে আসা যায়। আর বনু হাওয়াযিনের এই প্রস্তুতির খবর এভাবে পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা.) যখন মক্কা বিজয়ের জন্য মদীনা থেকে মক্কার দিকে রওয়ানা হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তিনি (সা.) অগ্রবর্তী দল হিসেবে কিছু লোককে বাহিনীর সামনে পাঠিয়ে দেন। এই অগ্রবর্তী দল হাওয়াযিনের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে, যে একজন গুপ্তচর ছিল এবং হাওয়াযিনের পক্ষ থেকে মুসলমানদের ওপর নজর রাখার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মহানবী (সা.) যখন তার কাছে জিজ্ঞেস করেনএবং ভালোভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তখন সে জানায়, বনু হাওয়াযিন প্রচুর সৈন্য একত্রিত করেছে এবং বনু সাকীফকেও নিজেদের সাথে যুক্ত করে নিয়েছে এবং ভারী অস্ত্র ও সরঞ্জামের জন্য জুরুশে প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছে।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৬৬-১৬৭) (আমতাউল আসমা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৫৬) (গাযওয়ায়ে হুনাইন, পৃ: ৮৩-৮৫) (আল লউলুল মাকনুন, সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৯ম খণ্ড, পৃ: ২৪০)বনু হাওয়াযিন এই প্রস্তুতির মাঝেই ছিল, ইতিমধ্যে মক্কা বিশেষ কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই সহজেই জয় হয়ে যায়। যার ফলে হাওয়াযিন গোত্র তাদের শক্তির অহংকারে এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, আমরা নিজেরাই মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের মোকাবিলার জন্য বের হবো। আর যেমনটি তাদের ধারণা ছিল- 'আমরাই হচ্ছিতারা, যারা মুসলমানদের পরাজিত করে তাদের নির্মূল করতে পারি'- এজন্য সেই সমস্ত গোত্র হাওয়াযিন গোত্রের নেতা, ত্রিশ বছর বয়সী যুবক মালিক বিন অওফকে নিজেদের সেনাপতি ও নেতা বানায় এবং বিশ হাজারের বাহিনী তৈরি হয়ে হুনাইনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।বনু হাওয়াযিনের সর্দার মালিক বিন অওফ এই যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য এমন একটি পদক্ষেপ নেয় যা আরবের ইতিহাসে সম্ভবত এর আগে কেউ নেয় নি। আর তা হলো, সেনাপতি প্রতিটি গোত্রের প্রত্যেক ব্যক্তিকে নির্দেশ দেয়, সে যুদ্ধের জন্য নিজের ঘর থেকে একা বের হবে না, বরং নিজের স্ত্রী-সন্তান, এমনকি নিজের সকল সম্পদ ও পশুপাল সাথে নিয়ে বের হবে। আর এটি দ্বারা তার উদ্দেশ্য ছিল, তার বাহিনীর প্রতিটি সৈনিক বীরত্বের সাথে প্রাণপণ যুদ্ধ করবে। এই কথা তার

মনে থাকবে যে, তার জন্য পলায়নের কোনো পথ নেই, কারণ তার স্ত্রী-সন্তান ও সকল সম্পদ তার সাথেই রয়েছে।

এই যুদ্ধে একজন বৃদ্ধ সর্দার দুরাইদ বিন সিম্মাহর যুদ্ধে বাধা দেওয়ারও উল্লেখ পাওয়া যায়, যে হাওয়াযিনের সাথে ছিল। লেখা আছে, বনু জুশামের মধ্যে দুরাইদ বিন সিম্মাহ নামে এক ব্যক্তি ছিল যার বয়স একশ বছরের অধিক ছিল। সে একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি ছিল যার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গিয়েছিল। তার মাঝে যুদ্ধ করার শক্তি ছিল না, কিন্তু সে অভিজ্ঞ এবং যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত ছিল। কোনো এক সময়ে বীরত্ব ও অশ্বারোহণে তার খ্যাতি ছিল। তারা তাকেও সাথে নিয়ে গিয়েছিল যেন তার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা থেকে উপকৃত হতে পারে। যখন মালিক বিন অওফ লোকদের সাথে মিলে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)-এর দিকে এগিয়েযাবার ব্যাপারে একমত হয় এবং লোকেরা তাদের সম্পদ, তাদের স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে বের হয়, এমনকি তারা আওতাস উপত্যকায় পৌঁছে যায় এবং তাঁবু স্থাপন করে, তখন বৃদ্ধ দুরাইদ বিন সিম্মাহ নীচে নেমে নিজের হাত দিয়ে মাটি স্পর্শ করে বলে, তোমরা কোন উপত্যকায় আছো? তখন তারা বলে, আওতাস উপত্যকায়। সে বলে, এটি ঘোড়া চলাচলের জন্য ভালো জায়গা, (মাটির) কাঠিন্যের দিক থেকে কোনো অসুবিধা নেই; এত নরম নয় যে, খুর দেবে যাবে। কিন্তু আমি শিশুদের কান্নার আওয়াজ এবং উট, গাধা, ছাগল ও গরুর আওয়াজ কেন শুনতে পাচ্ছি? তখন লোকেরা উত্তর দেয়, মালিক বিন অওফের নির্দেশে সকল শিশু, নারী এবং গবাদি পশু সাথে আনা হয়েছে। তখন দুরাইদ মালিককে বলে, তুমি তোমার জাতিরসর্দার। আজকের দিনের প্রভাব বাকি দিনগুলোর ওপর পড়বে। এই শিশু, উট, গাধা, ছাগল ও গরু কেন সাথে নিয়ে এসেছ? সে উত্তর দেয়, আমি চাই, আমি প্রত্যেক মানুষের পেছনে তার পরিবার-পরিজনকে দাঁড় করিয়ে দেবো, যেন সে শত্রুর সাথে প্রাণপণ লড়াই করে। দুরাইদ বলে, এটি অত্যন্ত ভুল মতামত। আল্লাহ্‌র কসম, তুমি শুধু ভেড়া চরাতেই জানো। [অর্থাৎ সে বলে, তুমি লড়াই করতে জানো না, তোমার লড়াইয়ের বিষয়ে কিছুই জানা নেই।]তারপর বলে, পরাজিত দলের পক্ষে কোনো জিনিস কি ফিরে পাওয়া সম্ভব? শোনো, যুদ্ধে তোমাদের উপকারার্থে শুধু এই বিষয়টিই রয়েছে যে, মানুষের বর্শা ও তরবারি কাজে আসবে। আর যদি যুদ্ধের ফলাফল তোমাদের বিপক্ষে যায় তাহলে তোমরা তোমাদের স্ত্রী-সন্তান ও সম্পদ হারিয়ে বসবে। হে মালিক! তুমি হাওয়াযিনের যোদ্ধা ও অশ্বারোহীদের কেন এগিয়ে দাও নি? সম্পদ, নারী ও শিশুদের নিজ জাতির দুর্গসমূহে পাঠিয়ে দাও, তারপর ঘোড়ায় চড়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করো এবং পদাতিক বাহিনী অশ্বারোহী বাহিনীর মাঝখানে থাকবে। যদি তোমাদের সফলতা লাভ হয়, তাহলে এরা অর্থাৎ এই লোকজন, শিশু, সম্পদ ও পশুপাল তোমাদের সাথে এসে মিলিত হবে। আর যদি তোমরা ব্যর্থ হও, তাহলে তোমরা তাদের কাছে চলে যেতে পারবে। এভাবে তোমাদের পরিবার-পরিজন ও সমস্ত গবাদি পশু রক্ষা পাবে। মালিক বিন অওফ বলে, আল্লাহ্‌র কসম! আমি এমনটি করব না এবং আমার সিদ্ধান্তওপরিবর্তন করব না। তুমি বৃদ্ধ হয়ে গেছো, তোমার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। দুরাইদ বলে, হে হাওয়াযিনের দল! আল্লাহ্‌র কসম, এই মতামত সঠিক নয়! এই ব্যক্তি তোমাদের নারীদের অপমানিত করবে এবং তোমাদেরকে শত্রুর হাতে সমর্পণ করে নিজে সাকীফের দুর্গসমূহে গিয়ে লুকিয়ে পড়বে। সুতরাং তোমরা ফিরে আসো এবং একে পরিত্যাগ করো। এভাবে সেযুদ্ধ না করার পরামর্শ দেয়। এতে মালিক অর্থাৎ যাকে সর্দার বানানো হয়েছিল- সে তার তরবারি বের করে এবং বলে, হে হাওয়াযিনের দল! আল্লাহ্‌র কসম, তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করতে হবে, নতুবা আমি আমার সমস্ত ভার এই তরবারির ওপর ছেড়ে দিয়ে এটি দ্বারা আমার বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবো। অর্থাৎ আত্মহত্যা করব। বনু হাওয়াযিন গোত্র পরস্পর পরামর্শ করে বলে, আল্লাহ্‌র কসম! যদি আমরা মালিকের অবাধ্যতা করি তাহলে সে নিজেকে মেরে ফেলবে, অথচ সে যুবক; তার বয়স ত্রিশ বছরের কাছাকাছি ছিল। তখন আমরা দুরাইদের সাথে থেকে যাব আর সে বৃদ্ধ, তার সাথে মিলে যুদ্ধ করা যাবে না।(অতএব) তোমরা মালিকের সাথে একমত হও। বস্তুত তা-ই হয়। মালিক দুরাইদকে জিজ্ঞেস করে, এর বাইরে আর কোনো মতামত আছে কিনা? তখন দুরাইদ বলে, হ্যাঁ, লুকানোর স্থানসমূহে তোমার লোকদের লুকিয়ে রাখো যারা তোমাদের সাহায্যকারী হবে। যদি শত্রু তোমাদের ওপর আক্রমণ করে তাহলে এরা তাদের পেছন থেকে আক্রমণ করবে। তাহলে তোমরা নিজেদের সঙ্গীসাথিদের নিয়ে পুনরায় আক্রমণ করতে পারবে। আর যদি তোমরা আক্রমণ করো তাহলে তাদের মধ্যে একজনও পেছনে সরবে না। তখন মালিক তার সাথিদের বলে, তারা যেন গিরিপথ ও উপত্যকার পাদদেশে লুকিয়ে থাকে। প্রথম আক্রমণটি একেবারে একসাথে করতে হবে যেন ইসলামী বাহিনীকে পরাজিত করা যায়। (শারাহুল আল্লামা যুরকানি, ৩য় ভাগ, পৃ: ৫০০-৫০১) (সীরাতুন নবী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৫৫)

মহানবী (সা.)-এর কাছেও বনু হাওয়াযিনের প্রস্তুতির খবর পৌঁছে গিয়েছিল, যার বিস্তারিত বিবরণ এরূপ; পূর্বেও কিছুটা বর্ণিত হয়েছিল: আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)-এর কাছে মক্কায় এসব ঘটনার সংবাদ পৌঁছলে মহানবী (সা.) হাওয়াযিন গোত্রের বাহিনীর অবস্থার খোঁজখবর নেবার জন্য হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আবু হাদরাদ আসলামীকে পাঠান। প্রথমে তাদের (অর্থাৎ শত্রুপক্ষের) সেই গুপ্তচর কিছু সংবাদ দিয়েছিল যে, অস্ত্র সংগ্র হ করা হচ্ছে। এখন এই প্রস্তুতি সম্পন্ন হবার পর তিনি (সা.) সংবাদ সংগ্রহের জন্য আবার নিজের একজন লোক প্রেরণ করেন, যিনি ছিলেন আবদু ল্লাহ্ বিন আবু হাদরাদ আসলামী। তিনি হাওয়াযিনের বাহিনীতে প্রবেশ করেন এবং তাদের ভেতর ঘোরাঘুরি করে সব ধরনের তথ্য সংগ্রহ করেন। তিনি এক বা দুই দিন তাদের মাঝে অবস্থান করেন, এমনকি তিনি মালিককে একথাও বলতেশোনেন যা সে তার সাথিদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য বলছিল যে, মুহাম্মদ (সা.) ইতিপূর্বে এমন কোনো জাতির সাথে যুদ্ধ করেন নি যারা যুদ্ধের কলাকৌশল জানে। তিনি এমন জাতিরযুবকদের সাথে যুদ্ধ করেছেন যাদের যুদ্ধের জ্ঞান নেই, তাই তিনি তাদের ওপর বিজয়ী হয়েছেন। অতএব প্রভাত হবার সাথে সাথেই তোমরা তোমাদের পেছনে গবাদি পশুপাল এবং তোমাদের নারীদের সারিবদ্ধ করে নিও, তারপর একযোগে আক্রমণ কোরো। আর তোমরা তোমাদের তরবারির খাপ ভেঙে ফেলো ও বিশ হাজার উন্মুক্ত তরবারির মাধ্যমে লড়াই কোরো এবং একজন বীরপুরুষের ন্যায় আক্রমণ রচনা কোরো। আর তোমরা ভালোভাবে জেনে রাখো- বিজয় তারাই লাভ করবে, যারা সর্বপ্র থম আক্রমণ করবে। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবু হাদরাদ মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন এবং তাঁকে সমস্ত সংবাদ প্রদান করেন। মহানবী (সা.) বাধ্য হয়ে মোকাবিলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। মহানবী (সা.) বনু হাওয়াযিন গোত্রের সাথে মোকাবিলা করার জন্য মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে সমীক্ষা করলে দেখা যায়, আসন্ন যুদ্ধের জন্য ইসলামী সৈন্যবাহিনীর নিকট যুদ্ধসামগ্রী অনেক কম ছিল। এই ঘাটতি পূরণের জন্য মহানবী (সা.) মক্কার ধনাঢ্য সর্দার সাফওয়ান বিন উমাইয়ার কাছে কিছু অস্ত্র ধার চান- যে তখনো মুশরিক ছিল। সে মহানবী (সা.)-কে বলে, আপনি কি আমার সম্পদ ধার নিতে চান নাকি জোরপূর্বক নিয়ে নিতে চান? তিনি (সা.) বলেন, না! আমি ধারস্বরূপ নিতে চাচ্ছি এবং এগুলো ফেরত দেবার নিশ্চয়তাও দিচ্ছি। তখনসে দেওয়ার জন্য রাজি হয়ে যায়। সে একশ বর্ম দেয় যার সাথে শিরস্ত্রাণ এবং ঢাল প্রভৃতিও ছিল। কিছু বর্ণনামতে, এই অস্ত্রসমূহ স্থানান্তরের জন্য সে সাথে করে উটও দিয়েছিল। যুদ্ধের পর সাফওয়ানের বর্মগুলো ফেরত দেওয়ার জন্য একত্রিত করা হলে সেখানে কিছু বর্ম কম ছিল। বর্মগুলো যেহেতু ফেরত দেবার জামানত দেওয়া হয়েছিল, তাই মহানবী (সা.) সাফওয়ানের সাথে কথা বলেন যে, সেগুলোর মূল্য নিয়ে নাও। কিন্তু বর্মগুলো দেবার সময় যে সাফওয়ান ছিল, এখন আর সে সেই সাফওয়ান ছিল না। সাফওয়ান নিজেও হুনাইনের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। অবশ্য সেসময় সে মুশরিক ছিল এবং হুনাইনের যুদ্ধের পর সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। অর্থাৎ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল ঠিকই, কিন্তু মুশরিক ছিল; আর হুনাইনের যুদ্ধের পর ইসলাম গ্রহণ করে। এ কারণে মহানবী (সা.) বর্মগুলোর মূল্য দিতে চাইলে সাফওয়ান বলে, لَا ـ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ! لِاَنَّ فِیْ قَلْبِیْ الْیَوْمَ مَالَمْ یَکُنْ یَوْمَئِذٍ - জ্বি না, হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)! কেননা আজ আমার হৃদয়ের অবস্থা যেমন- সেদিন তেমনটি ছিল না।

সে (ক্ষতিপূরণ) নিতে অস্বীকৃতি জানায়। একইভাবে মহানবী (সা.) আপন চাচাতো ভাই নওফেল বিন হারেস-এর কাছ থেকেও তিন হাজার বর্শা ধার নেন এবং বলেন, আমি তোমার এসব বর্শা শত্রুদের পিঠে বিদ্ধ হতে দেখতে পাচ্ছি। মহানবী (সা.)-এর এই কথার মাঝে এ সংবাদ নিহিত ছিল যে, শত্রুরা পরাজয় বরণ করে পালাবে এবং তাদের অনেক প্রাণহানি ঘটবে। একইভাবে ইবনে আবি রবিয়া-র কাছ থেকেও কিছু অস্ত্র ধার নিয়েছিলেন। মহানবী (সা.)-

১৩০ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) ২০২৫ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৬, ২৭ ও ২৮ শে ডিসেম্বর ২০২৫ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্‌সানুল জাযা। (নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

এর মহান চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ প্রণিধানযোগ্য যে, তিনি (সা.) মক্কা বিজয় করে নিয়েছিলেন। এখন এটি একটি বিজীত জাতি ছিল আর যুদ্ধনীতি অনুযায়ী বিজয়ীরাই বিজিত জাতির সমস্ত ধনসম্পদের মালিক হয়ে থাকে। কিন্তু যুদ্ধের জন্য যখন অস্ত্রের প্রয়োজন দেখা দেয় তখন প্রতিটি অস্ত্র ধার নেওয়া হয়। আর এই অঙ্গীকার করা হয় যে, আমরা যতগুলো অস্ত্র নিচ্ছি ঠিক ততগুলো ফেরত দেবো।

একইভাবে আবু জাহলের সৎভাই আব্দুল্লাহ্ বিন আবি রবিয়ার কাছ থেকে মহানবী (সা.) ত্রিশ-চল্লিশ হাজার দিরহাম ঋণস্বরূপ গ্রহণ করেন। রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, এ ব্যক্তি মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন।

একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহানবী (সা.) কুরাইশের তিনজন ব্যক্তির কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিলেন। তিনি (সা.) সাফওয়ান বিন উমাইয়ার কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার দিরহাম, আব্দু ল্লাহ্ বিন আবি রবিয়ার কাছ থেকে চল্লি শ হাজার দিরহাম এবং হুওয়াইতিব বিন আব্দুল উযযার কাছ থেকে চল্লিশ হাজার দিরহাম ঋণ নিয়েছিলেন। সর্বমোট এক লক্ষ ত্রিশ হাজার দিরহাম। কিছু রেওয়ায়েত অনুযায়ী, মক্কা বিজয়ের সময় মহানবী (সা.) দরিদ্র সাহাবীদের জন্য নগদ অর্থ ঋণ নিয়েছিলেন- যা তিনি (সা.) তাদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছিলেন আর প্রত্যেক ব্যক্তিকে কমবেশি পঞ্চাশ দিরহাম করে দেওয়া হয়েছিল। আরেকটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী, বনু জাযীমার নিহত ব্যক্তিদের রক্তপণ ইত্যাদি আদায় করার উদ্দেশ্যে এ অর্থ ঋণস্বরূপ নেওয়া হয়েছিল। হতে পারে, মহানবী (সা.) নানাবিধ প্রয়োজনের তাগিদে এ অর্থ ঋণস্বরূপ নিয়েছিলেন, যার মাঝে আর্থিক সহযোগিতা এবং রক্তপণ অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন; ওয়াল্লাহু আ'লামু। এর বিস্তারিত বিবরণ আগামীতে বর্ণনা করব, ইনশাআল্লাহ্।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.),৯ম খণ্ড, পৃ: ২৩৬-২৩৮] (আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫৩) (সুনান দাউদ, কিতাবুল বুইয়ু, হাদীস-৩৫৬৩) (আল ইসতিয়াব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৯৬-৮৯৭) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৫৮) (গাযওয়ায়ে হুনান, পৃ: ৪৩)

নামাযের পর আমি দুইজন ব্যক্তির গায়েবানা জানাযা পড়াবো। একজন হলেন মরহুম খাজা মোখতার আহমদ বাট সাহেব, যিনি সিয়ালকোটের খাজা আব্দুর রহমান সাহেবের পুত্র ছিলেন। সম্প্রতি তিনি ৯২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন'। তিনি সিয়ালকোটে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আইনশাস্ত্রে শিক্ষা লাভের পরে তিনি এয়ার ফোর্সে যোগদান করেন। রিসালপুর থেকে এয়ার ফোর্সের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান এয়ার ফোর্সে একজন আইন বিষয়ক কর্মকর্তা হিসেবে বিশেষ সেবা প্রদান করেন। সেই বছর অন্যান্য আহমদী কর্মকর্তার সাথে তাকেও চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়।

১৯৭৪ সালে জামা'তে আহমদীয়ার বিরুদ্ধে সহিংসতার একটি সংবেদনশীল মুহূর্তে তিনি খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-র নির্দে শনা অনুযায়ী জামা'তের আইন কমিশনে কাজ করেন এবং জামা'তের চেষ্টা প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী হানিফ রামে-র সাথে সাক্ষাৎ করেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এবং হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব (রা.)-র সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক ছিল এবং উংংবহপব ড়ভ ওংষধস-এর প্রথম খণ্ড প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব (রা.)-কে সহযোগিতা করার সুযোগ পেয়েছেন। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে তিনি ফযলে উমর ফাউন্ডেশনের পরিচালক এবং বহু বছর রাবওয়ার দারুল কাযায় কাযী হিসেবে সেবা প্রদান করেন।

দারুল কাযায় আমিও কিছু দিন তার সাথে কাজ করেছি। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং বিনয়ী মানুষ ছিলেন। খিলাফতের সাথে সর্বদাই তার গভীর সম্পর্ক ছিল এবং পরবর্তীতে আমার সাথেও তার হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।

২০০২ সালে তিনি কানাডায় চলে যান এবং সেখানে আঞ্চলিক আমীর হিসেবে সেবা প্রদান করতে থাকেন। নামায ও কুরআন তিলাওয়াতে নিয়মিত ছিলেন এবং আর্থিক কুরবানীতে অনেক বেশি অংশগ্রহণকারী একজন নিষ্ঠাবান, ত্যাগী আহমদী ছিলেন। তার জীবন খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ততা, বিনয় এবং আন্ত রিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিল। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও এক কন্যা এবং দুই পুত্রসহ বহু নাতি-নাতনি রয়েছেন।

তার স্ত্রী আমাতুল কাইয়্যুম সাহেবা হলেন মরহুম গোলাম আহমদ আখতার সাহেবের কন্যা। গোলাম আখতার সাহেব রেলওয়েতে ডাইরেক্টর পদে কর্মরত ছিলেন; অর্থাৎ অনেক বড়ো পদে ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-র যুগে কিছু সময়ের জন্য নাযেরে আলা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) স্টেজে বক্তৃতা প্রদানের সময় তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বও পালন করেছেন। সর্বদা সেবা প্রদানকারী পরিবারের সদস্য ছিল। ইউকের কাযা বোর্ডের প্রধান ডা. জাহিদ খান সাহেবের শ্বশুর ছিলেন খাজা ইফতেখার সাহেব।

খাজা সাহেবের মেয়ে আয়েশা খান লিখেছেন, আমি তাকে সর্বদা খিলাফতের প্রতি আনুগত্যশীল পেয়েছি। আমাদের তিন ভাইবোনের তরবিয়ত এভাবে করেছেন- জামা'ত এবং খিলাফতের আনুগত্য ব্যতীত আমাদের জীবনের ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্যে থাকা অনুচিত;এটিই আমাদের শিখিয়েছেন। ১৯৭৪ সালে এয়ার ফোর্সের চাকরির হঠাৎ সমাপ্তি এবংব্যক্তিগতভাবে ওকালতি পেশায় তেমন একটা সাফল্য না পাওয়া সত্ত্বেও কখনোই তিনি ধৈর্য এবং আল্লাহ্ তা'লার ওপর পূর্ণ আস্থা হারান নি। কোনো মানুষের কাছে সাহায্যের হাত বাড়ান নি; নিজের যাবতীয় প্রয়োজন তিনি আল্লাহ্ তা'লার নিকটেই উপস্থাপন করেছেন। তার কন্যা বলেন, যখন থেকে আমি বুঝতে আরম্ভ করেছি, তখন থেকে তাকে সর্বদা একজন ইবাদতকারী হিসেবেই দেখতে পেয়েছি এবং প্রতিটি পুণ্য কাজে তাকে অংশগ্রহণকারী পেয়েছি। চাঁদা সর্বদা মাসের শুরুতেই প্রদান করতেন এবং যদি টাকা থাকত তাহলে অগ্রীম চাঁদা প্রদান করতেন। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার ক্ষেত্রে খুবই অগ্রগণ্য ছিলেন। যেমনটি আমি বলেছি, খিলাফতের সাথে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সম্পর্ক তো ছিলই, জামা'তের ব্যবস্থাপনার প্রতিও পরম অনুগত ছিলেন। তার অন্য সব ভাইও জামা'তের ব্যবস্থাপনা ও খিলাফতের সাথে একান্ত নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক রাখেন; তাদের পিতাও তা রাখতেন, কেননা তিনিই তাদের এভাবে তরবিয়ত করেছেন। আল্লাহ্র ফযলে এই পুরো পরিবারই জামা'তের সাথে পরম বিশ্বস্ততা প্রদর্শনকারী।

যেমনটি আমি বলেছি, তার সহধর্মিণী আখতার সাহেবের কন্যা ছিলেন। এটিও একটি সেবক পরিবার। যাহোক, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের তরবিয়ত বা সুশিক্ষার ফলেই তাদের সন্তানরাও জামা'তের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক রাখে এবং জামা'তের সেবায় নিয়োজিত আছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সন্তানদেরকে তাদের সৎকর্মগুলো অব্যাহত রাখার সৌভাগ্য দান করুন এবং মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন।

দ্বিতীয় জানাযা ও স্মৃতিচারণ হলো ভারতের নাযীর আহমদ সাহেবের সহধর্মিণী সাঈদা বেগম সাহেবার। সম্প্রতি ৭৫ বছর বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন'। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি মূসিয়া ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্বামী ছাড়াও তিন কন্যা ও চার পুত্র রেখে গেছেন; কাদিয়ানের নায়েব নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ তাহের আহমদ তারেক সাহেবের মা ছিলেন। তাহের আহমদ সাহেব জামা'তের প্রতিনিধিত্বে এখানে ইংল্যান্ডে এসেছিলেন এবং সেসময় তার মা ইন্তেকাল করার কারণে জানাযায় উপস্থিত থাকতে পারেন নি। এটিও অত্যন্ত সেবক একটি পরিবার। তার ছোটো ছেলে, তাহের সাহেবের ভাই শাব্বীর আহমদ সাহেবও জামা'তের একজন মোয়াল্লেম; তেমনিভাবে তার এক মেয়েও মুরব্বী সিলসিলাহ জাব্বার সাহেবের সহধর্মিণী। অন্য দুই পুত্রও জামা'তের সেবায় নিয়োজিত। এটিও অত্যন্ত সেবক একটি পরিবার। আল্লাহ্ মরহুমার প্রতি ক্ষমার আচরণ করুন।

তাহের আহমদ তারেক সাহেব লিখেছেন, গত পঁচিশ বছর যাবৎ তার মা শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন এবং পরম ধৈর্য ও গাম্ভীর্যের সাথে তিনি অসুস্থতার সময় পার করেছেন, কখনোইঅভিযোগ-অনুযোগ করেন নি। তিনি জম্মু -কাশ্মীরের চারকোট রাজৌরির অধিবাসী ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত কাজী মুহাম্মদ আকবর ভাট্টি সাহেবের মাধ্যমে তাদের বংশে আহমদীয়াতের সূচনা হয়। পরবর্তীতে তাদের পরিবারে আহমদীয়াত বিস্তৃতি লাভ করে। তিনি অত্যন্ত ধার্মিক এবং নামায ও রোযার প্রতি যত্ন বান ছিলেন। স্বল্পশিক্ষিতা হওয়া সত্ত্বেও শৈশবে সন্ধ্যা হলে আমাদের কু রআনের দোয়া, হযরত মসীহ্মওউদ (আ.)-এর নযম, হাদীস ও নবীদের ঘটনা শোনাতেন। তিনি খুবই পরিপাটি ও পরিচ্ছন্ন স্বভাবের ছিলেন। তিনি খুবই মিশুক এবং আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে স্নেহ ও ভালোবাসা প্রদর্শনকারিণী ছিলেন। তিনি খিলাফত ও জামা'তের ব্যবস্থাপনার প্র তি গভীর ভালোবাসা পোষণ করতেন। আর স্বেচ্ছায় আমাদেরকে ওয়াকফ বা উৎসর্গ করেছেন এবং ওয়াকফের দায়িত্ব পালনের বিষয়ে সর্বদা উদ্বু দ্ধ করতেন। তিনি প্রতিদিন আমাদেরকে কু রআন শেখার জন্য প্রস্তুত করে পাঠাতেন। এর পাশাপাশি আমাদের জাগতিক শিক্ষাদীক্ষার বিষয়েও মনোযোগী ছিলেন। প্রত্যেক সন্তানকেই উত্তম শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন। (আমীন)

****

অঙ্গ সংগঠনগুলির বাৎসরিক ইজতেমা(২০২৫)

আগামী ২৪,২৫ ও ২৬ শে অক্টোবর, ২০২৫ সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর অনুমোদন ক্রমে এবছর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ভারত, মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্ ভারত-এর বাৎসরিক ইজতেমা কাদিয়ান দারুল আমান-এর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। জামাতের সদস্যদের সেই অনুসারে দোয়ার মাধ্যমে এই সকল ইজতেমায় অংশগ্রহণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। (সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ভারত)

খোদা তা'লার অস্তিত্বের দশটি প্রমাণ

মূল রচনা–হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)

এই যুগে ধর্ম বিশ্বাস এবং ঈমানের বিষয়ে বস্তুবাদিরা যে সমস্ত আপত্তি করেছে , সেগুলির মধ্যে সব থেকে বড় বিষয়টি হল খোদা তা'লার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। পৌত্তলিকরা যদিও খোদার অংশীবাদি তৈরী করে, কিন্তু অন্তত তারা খোদা তা'লার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। অপরদিকে নাস্তিকরা সম্পূর্ণরূপে খোদাকে অস্বীকার করে। বর্তমান বিজ্ঞানের ভিত্তি প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যপ্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই কারণে নাস্তিকরা প্রশ্ন করে, সত্যিই যদি কোনও খোদা থাকেন, তবে আমাদেরকে দেখাও। তাঁকে না দেখে আমরা কিভাবে বিশ্বাস করব? কেননা এযুগের প্রবণতা অধিকাংশ যুবকের হৃদয় থেকে সেই পবিত্র সত্তার চিত্র মুছে ফেলেছে। কলেজের শত শত ছাত্র ও ব্যারিস্টার ও আরও অনেকে খোদা তা'লার অস্তিত্বকে অস্বীকারকরে চলেছে আর যাদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। হাজার হাজার এমনও মানুষ আছে যারা দেশ ও জাতির ভয়ে বাহ্যত প্রকাশ করে না ঠিকই, কিন্তু বাস্তবে তারা খোদার অস্তিত্বে মোটেই বিশ্বাসী নয়। সেই কারণেই আমি মনঃস্থির করেছি, যদি আল্লাহ্ তা'লা আমাকে তৌফিক দেন, আমি এ বিষয়ে একটি ছোট্ট টিকিট লিখে প্রকাশ করব। যদি কোনও পুণ্যবান এর থেকে উপকৃত হয়!

১) নাস্তিকদের প্রথম প্রশ্ন হল, যদি খোদা আছেন, তবে আমাদেরকে দেখাও, আমরা মেনে নিব।

আমি বেশ কয়েকবার এই প্রশ্নটি শোনার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু সব সময় এটি শুনে আশ্চর্যই হয়েছি। মানুষ বিভিন্ন বস্তুকে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারা সনাক্ত করে। যেমন কোন বস্তুকে দেখে, কোন বস্তুকে স্পর্শ করে, কোনটিকে গন্ধ দ্বারা, কোনটি কানে শুনে আবার কোনটির স্বাদ গ্রহণ করে। মানুষ রঙ চেনে চোখে দেখে, ঘ্রাণ নিয়ে, স্পর্শ করে বা স্বাদ গ্রহণ করে নয়। এখন যদি কেউ বলে যে সে রঙকে তখনই স্বীকার করবে যখন এর শব্দ শুনবে, তবে সেই ব্যক্তি কি নির্বোধ নয়? অনুরূপভাবে শব্দ কানে শুনার মাধ্যমে সনাক্ত করা যায়। কিন্তু যদি কোনও ব্যক্তি বলে, 'আমাকে অমুক ব্যক্তির শব্দ দেখাও, আমি তা দেখেই বিশ্বাস করব যে সে কথা বলতে পারে। এমন ব্যক্তি মূর্খ নয় কি? অনুরূপভাবে ঘ্রাণ নেওয়ার মাধ্যমে জানা যায়, কিন্তু যদি কেউ দাবি করে যে, যদি তাকে গোলাপের গন্ধের স্বাদ গ্রহণ করাও তবেই সে বিশ্বাস করবে–তবে এমন ব্যক্তিকে কি আর বুদ্ধিমান বলা যেতে পারে? এর বিপরীতে স্বাদ গ্রহণ করে জানা যায় এমন বস্তু, যেমন টক, মিষ্টি, তেতো, নোনতা দ্রব্যের ঘ্রাণ গ্রহণের মাধ্যমে কেউ যদি সনাক্ত করতে চায়,তবে কখনই সে এমনটি করতে পারবে না। কাজেই যে বস্তু চোখে দেখা যায় সেটিকে বিশ্বাস করতে হবে আর যেটি চোখে দেখা যায় না, সেটিকে অস্বীকার করতে হবে, এমনটি আবশ্যক নয়। অন্যথায় এভাবে গোলাপের সুগন্ধ, লেবুর অম্লতা, মধুর মিষ্টতা, ঘৃতকুমারীর তিক্ততা, লৌহের দৃঢ়তা, শব্দের বৈশিষ্ট্য–এসব কিছুই অস্বীকার করতে হবে। কেননা এগুলি চোখে দেখা যায় না। বরং ঘ্রাণ নিয়ে, স্বাদ গ্রহণের মাধ্যমে এবং শ্রবণের মাধ্যমে জানা যায়। কাজেই এই আপত্তি কতটা অন্যায্য যে, 'আমাদেরকে খোদা দেখাও, তবেই আমরা বিশ্বাস করব! এমন আপত্তিকারী কি গোলাপের সুগন্ধ ও মধুর মধুরতা চোখে দেখে তবেই বিশ্বাস করে? তবে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে এমন শর্ত কেন রাখা হয় যে দেখাও তবেই বিশ্বাস করব?

এছাড়াও মানুষের সত্তায় এমন সব বস্তু বিদ্যমান যেগুলিকে সে না দেখেই বিশ্বাস করে আর সে বিশ্বাস করতে বাধ্য। প্রত্যেক মানুষ নিজের যকৃত, মস্তিষ্ক, অন্ত্র, ফুসফুস, কিডনী দেখে তবেই কি বিশ্বাস করে না কি না দেখে? এই বস্তুগুলি যদি তাকে দেখানোর জন্য বের করা হয়, তবে মানুষ তৎক্ষণাৎ মারা যাবে, দেখার দরকারও পড়বে না।

এই উদাহরণগুলি আমি দিলাম একথা বোঝানোর জন্য যে, সব কিছু কেবল চোখে দেখেই জানা যায় না। বরং পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রীয়ের সাহায্য নিয়ে সেগুলি চেনা যায়। এখন আমি বলছি, অনেক বস্তু এমন আছে যেগুলির সঙ্গে এই পঞ্চেন্দ্রীয়ের সরাসরি সম্পর্কও নেই। বরং সেগুলি জানার ভিন্ন মাধ্যম রয়েছে। যেমন বুদ্ধি, স্মৃতি বা মস্তিষ্ক এমন বস্তু যেগুলিকে পৃথিবীর কেউই অস্বীকার করে না। কিন্তু কেউ কি বুদ্ধিকে চোখে দেখেছে বা কানে শুনেছে বা স্বাদ নিয়ে দেখেছে বা ঘ্রাণ নিয়েছে বা স্পর্শ করে দেখেছে। তবে কিভাবে জানা গেল যে, বুদ্ধি বলে কোনও বস্তু আছে বা স্মৃতির অস্তিত্ব বিদ্যমান? এরপর শক্তির বিষয়টিই দেখ! প্রত্যেক ব্যক্তির শরীরে একটু না একটু শক্তি অবশ্যই আছে। কেউ দুর্বল, কেউ আবার শক্তিশালী, কিন্তু শক্তি সকলেরই আছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত শক্তিকে কি কেউ দেখেছে, শুনেছে বা স্বাদ নিয়ে দেখেছে? তবে কিভাবে বোঝা গেল যে শক্তি নামে কোন জিনিষ আছে? এ বিষয়টি একজন চরম নির্বোধ ব্যক্তিও অনুধাবন করতে পারে যে, এই জিনিসগুলি আমরা নিজেদের ইন্দ্রীয় দ্বারা সনাক্ত করি নি, বরং এগুলির প্রভাব জানার মাধ্যমে সেগুলি উপলব্ধি করেছি। যেমন, আমরা যখন দেখি মানুষ নানাবিধ সমস্যায় পড়ে কিছুক্ষণের জন্য চিন্তামগ্ন হয়, আর এমন কোনও উপায় বের করে, যার মাধ্যমে সে নিজের সমস্যাবলী দূর করে নেয়– এভাবে সমস্যা দূর করতে দেখে আমরা বিশ্বাস করে নিয়েছি যে, মানুষের মধ্যে এমন কোনও বস্তু আছে যা এই সব ক্ষেত্রে তার কাজে আসে আর আমরা সেই বস্তুর নাম রেখেছি বুদ্ধি। কাজেই পঞ্চেন্দ্রীয়েরকোনওটির দ্বারাই আমরা সরাসরি বুদ্ধিকে চিনি নি। বরং এর অসাধারণ ক্রিয়াকলাপ দেখে তাকে জানতে পেরেছি। অনুরূপভাবে আমরা মানুষকে কোনও ভারি বস্তু বহন করতে দেখে জানতে পারলাম যে তার মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য আছে যার দ্বারা সে ভর বহন করতে পারে, নিজের তুলনায় দুর্বল বস্তু ও ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে, মানুষ যার নাম রাখল শক্তি।

অনুরূপভাবে যত কিছু অতীন্দ্রিয় বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করবে, সেগুলি মানুষের দৃষ্টির অন্তরালেই থাকবে। আর সব সময় বাহ্যিক প্রভাব দ্বারা সেগুলির অস্তিত্ব জ্ঞাত করতে হবে। সেগুলিকে স্বচক্ষে দেখে, ঘ্রাণ নিয়ে বা স্বাদ গ্রহণ করে জানা সম্ভব নয়। কাজেই আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে, যিনি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, এমন সব উদ্ভট বাধা আরোপ করা কিভাবে বৈধ হতে পারে যে, চোখে না দেখে আমরা মানব না? কেউ কি কখনও বিদ্যুত চোখে দেখেছে? এছাড়া যার সাহায্যে বেতার বার্তা পৌঁছয়, যন্ত্রপাতি সচল থাকে, আলো জ্বালানো হয়, অদৃশ্য বলে কি সেই বিদ্যুতকেও অস্বীকার করা যায়? ইথার সম্পর্কিত গবেষণা পদার্থবিজ্ঞানের জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা কি এটিকে দেখার, শ্রবণ করার, স্পর্শ করার কিম্বা স্বাদগ্রহণ করার কোনও পদ্ধতি বের করতে পেরেছে? কিন্তু যদি এর অস্তিত্বকে অস্বীকার করি, তবে সূর্যের রশ্মি কিভাবে পৃথিবীতে পৌঁছাচ্ছে তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কাজেই এই সব সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকা সত্ত্বেও বলা হচ্ছে যে খোদাকে দেখাও তবেই আমরা স্বীকার করব– এ কেমন অনাচার! আল্লাকে অবশ্যই দেখা যায়, তবে সেই চোখে যা তাঁকে দেখার যোগ্য। তাঁকে যদি কেউ দেখার বাসনা রাখে, তবে তিনি তো স্ব মহিমায় পৃথিবীর সামনেই রয়েছেন, অন্তরালে থাকা সত্ত্বেও যিনি সব বেশি প্রকাশ্য। কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা এই বিষয়টিকে অত্যন্ত সংক্ষেপে কিন্তু এক অসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন।

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

দৃষ্টি তাঁহার নাগাল পাইতে পারে না, কিন্তু তিনি দৃষ্টির নাগাল পাইয়া থাকেন। বস্তু ত তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম,সম্যক অবহিত। (আলআনআম, আয়াত: ১০৪)

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে এবিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, তোমাদের দৃষ্টি খোদাকে দেখতে সমর্থ নয়, কেননা, তিনি অতীব সূক্ষ্ম তথা নিরাকার সত্তা। অতীব সূক্ষ্ম বা অদৃশ্য নিরাকার বস্তু তো দেখা যায় না। যেমন শক্তি, বুদ্ধি, আত্মা, বিদ্যুত, ইথার– এই বস্তুগুলি কখনই দেখা যায় না। তবে খোদার অতীন্দ্রিয় সত্তা পর্যন্ত মানুষের দৃষ্টি কিভাবেই বা পৌঁছতে পারে? তবে খোদাকে মানুষ কিভাবে দেখতে পারে আর তাঁর পরিচয় লাভের উপায় কি? এর উত্তর তিনি দিয়েছেন, 'ওয়া হুয়া ইউদরিকুল আবসার'। অর্থাৎ তিনি স্বয়ং দৃষ্টি পর্যন্ত পৌঁছন। আর এ সত্ত্বেও যে মানুষের দুর্বল দৃষ্টি তাঁর উৎস পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, তিনি স্বীয় শক্তিমত্তা ও পরিপূর্ণ গুণাবলী

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাহাকে মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য উত্থিত করা হইয়াছে। তোমরা ন্যায় সঙ্গত কাজের আদেশ দিয়া থাক এবংঅসঙ্গত কাজ হইতে বারণ করিয়া থাক এবং আল্লাহতে ঈমান রাখ। (আলে ইমরান:১১১)

দোয়াপ্রার্থী: Late Sawkat Ahmad Molla & Jahanara Bibi
From-Sabina Parveen. Banshra, 24 PGS (S)

যুগ খলীফার বাণী

"জাতি সত্তা অর্জনের জন্য ঐক্য ও আনুগত্য অত্যন্ত জরুরী।" **(খুতবা জুমআ, প্রদত্ত- ৫ ডিসেম্বর, ২০১৪)**

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, Bankura (W.B)

প্রকাশের মাধ্যমে স্বয়ং নিজেকে মানুষের চোখে ধরা দেন। আর যদিও মানুষের জড় দৃষ্টি তাঁকে দেখতে অপারগ, কিন্তু তিনি নিজ সত্তাকে স্বীয় অসীম শক্তি ও ক্ষমতাবলে বিভিন্ন রূপে মেলে ধরেন। কখনও প্রতাপপূর্ণ নিদর্শনের মাধ্যমে, কখনও আম্বিয়াদের মাধ্যমে, কখনও করুণার মাধ্যমে আবার কখনও দোয়ার গ্রহণীয়তার মাধ্যমে। এখন এ বিষয়টি প্রমাণ হল যে যদি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিশ্বাস তাঁর দৃশ্যমান হওয়ার উপর নির্ভরশীল হয়, তবে পৃথিবীর ৪-৫টি বস্তুকে অস্বীকার করতে হবে; অনেক দার্শনিকের মতে সব কিছুকেই অস্বীকার করতে হবে।কেননা তাদের মতে পৃথিবীতে কোনও বস্তুই দৃশ্যমান নয়, বরং আমরা কেবল গুণাবলীরই মাধ্যমেই সেগুলি দেখতে পাই। এখন আমি এবিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে, কোন্ কোন্ দলিলের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা যায় আর মানুষের বিশ্বাস জন্মে যে তার কোনও স্রষ্টা আছে, সে নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করে নি।

প্রথম দলিল

আমার ধর্ম বিশ্বাস, কু রআন শরীফ আধ্যাত্মিক ঔৎকর্ষ অর্জনের সকল উপায় বর্ণনা করেছে, সেই অনুসারে আমি আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের সমস্ত দলিল কুরআন শরীফ থেকেই উপস্থাপন করব। 'ওয়া মিনাল্লাহিত তওফীক'। মানুষ এই পৃথিবীতে এসে সর্বপ্রথম যে জ্ঞান লাভ করে তা কানের মাধ্যমে। এই কারণে আমিও সর্বপ্রথম শ্রবণ-সম্পর্কিত প্রমাণ পেশ করব।

আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে একস্থানে বলেন

"অবশ্যই সে সফলকাম হইবে যে পবিত্রতা অবলম্বন করিবে, এবং তাহার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে এবং নামায পড়ে। কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকেই অগ্রাধিকার দিতেছ, অথচ পরকালই অধিকতর উত্তম ও স্থায়ী। নিশ্চয় ইহা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে (উল্লিখিত) আছে-ইব্রাহিম ও মূসার গ্রন্থসমূহে।

(আল-আলা: ১৫-২০)

অর্থাৎ সেই ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে যে পবিত্র হয়েছে। আর সে মৌখিকভাবে নিজ প্রভু - প্রতিপালককে স্বীকার করেছে, কেবল মৌখিকভাবেই নয়, বরং ব্যবহারিকভাবেও ইবাদত করে নিজের স্বীকারুক্তির স্বপক্ষে প্রমাণ দিয়েছে। কিন্তু তোমরা তো বস্তুবাদি জীবনযাপন অবলম্বন কর, অথচ চূড়ান্ত পরিণাম উত্তম হওয়াই প্রকৃত উন্নতি আর সেটি দীর্ঘস্থায়ী। আর একথাটি কেবল কুরআন শরীফই উপস্থাপন করে না, বরং পূর্বের সমস্ত ধর্মগ্রন্থে এই দাবি বিদ্যমান। ইব্রাহিম (আ.) এবং মূসা (আ.) পৃথিবীর সামনে যে শিক্ষ উপস্থাপন করেছেন, সেখানেও এই শিক্ষা বিদ্যমান।

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা কুরআনের বিরোধীদের সামনে এই দলিল উপস্থাপন করেছে যে, নিজেদের প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ত্যাগকারী, খোদার সত্তাকে মান্যকারী এবং তাঁর প্রকৃত আনুগত্যকারীরা সব সময় সফল হয়। আর এই শিক্ষার সত্যতার প্রমাণ হল, এই বাণী পূর্ববর্তী ধর্মের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং তৎকালীন যুগের প্রধান ধর্ম খৃষ্টান, ইহুদী এবং মক্কার কাফেরদের উপর 'হুজ্জাত' (অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ) পূর্ণ করার জন্য হযরত ইব্রাহিম এবং হযরত মূসা (আ.)-এর এই দৃষ্টান্ত দিয়েছে যে, তাঁদেরকে তো তোমরা মান্য কর, তাঁরাও তো এই শিক্ষা দিয়েছেন। কাজেই কুরআন করীম খোদা তা'লার অস্তিত্বের এটিও একটি বিরাট প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছে যে, সমস্ত ধর্ম এ বিষয়ে ঐক্যমত এবং প্রত্যেক ধর্মে এটি সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়। কাজেই এই দলিলটির বিষয়ে যতই অনুধাবন করা যায়, ততই তা স্পষ্ট ও সত্য হিসেবে প্রতিভাত হয়। বস্তুত পৃথিবীর সকল ধর্ম এবিষয়ে একমত যে কোনও এক সত্তা রয়েছে যে সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করেছে। দেশ এবং সমাজের ভিন্নতার কারণে চিন্ত াধারা এবং ধর্মবিশ্বাসে তারতম্য লক্ষ্য করা যায় বটে, তথাপি তা সত্ত্বেও সেখানে যে সমস্ত ঐতিহাসিক ধর্ম রয়েছে, সেগুলি সবই আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব একবাক্যে স্বীকার করে। যদিও তাঁ র গুণাবলীর বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে, কিন্তু সমকালীন ধর্ম অর্থাৎ ইসলাম, খৃষ্টবাদ, ইহুদী, বৌদ্ধ, শিখ, হিন্দু এবং যুরাথিস্টি-সকলে অবশ্যই একজন খোদা, ঈশ্বর, পরমেশ্বর, পরমাত্মা, সতগুরু কিম্বা ভিষদানে -এর অস্তিত্বে বিশ্বাসী। কিন্তু যে সকল ধর্মসমূহ ধরাপৃষ্ট থেকে মুছে গেছে, প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ থেকে সেগুলি সম্পর্কে ও জানা যায়, তারা প্রত্যেকেই কোনও না কোনও খোদায় বিশ্বাসী ছিল। তা সেই ধর্মের উদ্ভব আমেরিকার মত বিচ্ছিন্ন কোনও দেশে হোক বা আফ্রিকার কোনও জঙ্গলে, রোমে হোক কিম্বা ইংল্যাণ্ডে, জাভা সুমাত্রায় হোক বা জাপানে বা চিনে বা সাইবেরিয়ায় বা মাঞ্চুরিয়ায়- সমস্ত ধর্মের মধ্যে এই সাদৃশ্য কিভাবে তৈরী হল? সুদূর আমেরিকায় বসবাস কারীদেরকে ভারতের অধিবাসীদের ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে বা চিনের অধিবাসীদেরকে আফ্রিকার ধর্মমত সম্পর্কে কে অবগত করল? প্রাচীনযুগে রেল, টেলিগ্রাম, ডাক যোগাযোগ ইত্যাদি ব্যবস্থা তো আর ছিল না যেমনটি আজকের দিনে আছে, না এতবেশি বিমান চলাচল করত। তখন ঘোড়া ও খচ্চরই ছিল যোগাযোগের অন্যতম বাহন। আর পালতোলা জাহাজ এ যুগের একদিনের সফর করত কয়েক মাসে। আর সেই যুগে পৃথিবীর অধিকাংশ ভূ-খণ্ডই তো ছিল অনাবিষ্কৃত। তবে সেই ভিন্ন ভিন্ন রুচিবোধ, সংস্কৃতি এবং লোকাচার, এবং অজ্ঞাতদেশসমূহে ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে এই সাদৃশ্য কিভাবে ঘটল? অবাস্তব কল্পকাহিনীতেও দুইজনের সমাপতন হওয়া দুষ্কর হয়। তবে পারস্পরিক মত বিনিময়ের সুযোগ নেই এমন সব জাতি ও দেশের এই অদ্ভুত সমাপতন কি এ বিষয়ের দলিল নয় যে, এই ধর্মবিশ্বাস এক বাস্তব সত্য আর তা প্রত্যেক জাতি ও ধর্মের সামনে প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে এক অজ্ঞাত উৎসের মাধ্যমে যা ইসলাম উন্মোচন করেছে? ইতিহাসবিদগণ এবিষয়ের উপর ঐক্যমত যে, যেবিষয়ের উপর বিভিন্ন জাতির ইতিহাসবিদ ঐক্যমত, তার সত্যতার বিষয়ে সন্দিহান হওয়া উচিত নয়। কাজেই এই বিষয়ে যখন হাজার হাজার জাতি ঐক্যমত, তবে কেনই বা বিশ্বাস করা হবে না যে, কোনও এক দিব্য-ঝলক দেখেই সমগ্র জগত এই মতবাদে বিশ্বাসী হয়েছে?

দ্বিতীয় দলিল

কুরআন করীম আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে দ্বিতীয় যেদলিলটি উপস্থাপন করেছে সেটিএই আয়াত থেকে জানা যায় -

"এবং ইহা ছিল আমাদের যুক্তি-প্রমাণ, যাহা আমরা ইব্রাহিমকে তাহার জাতির বিরুদ্ধে প্রদান করিয়াছিলাম। আমরা যাহাকে চাহি মর্যাদায় উন্নীত করি, নিশ্চয় তোমার প্রভু পরম প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞানী। এবং আমরা তাহাকে দান করিয়াছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব, আমরা তাহাদের প্রত্যেককে হিদায়াত দিয়াছিলাম; এবং ইতিপূর্বে আমরা হেদায়াত দিয়াছিলাম নূহকে এবং তাহার বংশধর হইতে দাউদ এবং সুলায়মান এবং আইউব এবং ইউসুফ এবং মূসা এবং হারূনকে। এবং এইরূপে আমরা সৎ - কর্মশীলদিগকে প্রতিদান দিয়া থাকি। এবং (আমরা হেদায়াত দিয়াছিলাম) যাকারিয়া এবং ইয়াহইয়া এবং ঈসা এবং ইলইয়াসকে, তাহারা সকলেই সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এবং (আমরা হেদায়াত দিয়াছিলাম) ইসমাঈল এবং আল ইসায়াসায়া এবং ইউনুস এবং লুতকে; এবং তাহাদের প্রত্যেককেই আমরা বিশ্ববাসীগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছিলাম।

(আনআম,আয়াত: ৮৪-৮৭)

এর কয়েকটি আয়াতের পর পুনরায় বলা হয়েছে ইহারাই ঐ সকল লোক, যাহাদিগকে আল্লাহ্ হেদায়াত দান করিয়াছেন, সুতরাং তুমি তাহাদের হেদায়াতের অনুসরণ কর। (আলআনআম, আয়াত: ৯১)

এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, এমন পুণ্যবান ও পবিত্র লোকেরা যে বিষয়ের পক্ষে সাক্ষী দেয় তা গ্রহণ করা উচিত নাকি সেই বিষয় যা অন্যান্য অজ্ঞ লোকেরা বলে, যারা নিজেদের চালচলন দ্বারা তাঁদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না? সোজা কথা এই যে, সেই সব লোকের কথাকেই মূল্য দেওয়া হবে, যারা নিজেদের চালচলন এবং কর্মধারা দিয়ে পৃথিবীতে নিজেদের সৎকর্মশীলতা, পবিত্রতা, সাধুতা এবং সত্যবাদিতা প্রমাণ করেছে। কাজেই তাদেরকে অনুসরণ করা এবং তাদের বিপক্ষে অন্যান্য লোকেদের কথাকে প্রত্যাখ্যান করা প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য। তাই আমরা দেখি যে, সৎকর্ম ও সদভাবনার প্রসারকারী যে সমস্ত মানুষ পৃথিবী থেকে গত হয়েছেন আর যারা নিজেদের কর্ম ধারা দ্বারা পৃথিবীতে নিজেদের সত্যতার সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাঁরা সকলেই এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেন যে, এমন এক সত্তা রয়েছে যাকে ভিন্ন

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: **Jahanara Begum, Bhagbangola, (Murshidabad)**

যুগ খলীফার বাণী

জাগতিক কামন-বাসনা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এটি এড়িয়ে চলা আবশ্যক।

(খুতবা জুমআ, ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam Master, Nararvita (Assam)**

ভিন্ন ভাষায় আল্লাহ্, গড বা পরমেশ্বর নামে স্মরণ করা হয়। ভারতের সাধুপুরুষ রামচন্দ্র কৃষ্ণ (আ.), ইরানের যুরাথিস্ত, মিশরের মুসা, নাসেরার মসীহ, পাঞ্জাবের এক সাধু নানক এর পর রয়েছেন সাধুগণের নেতা আরবের জ্যোতি মহম্মদ মুস্তাফা (সা.), যাঁকে তাঁর জাতি শৈশব থেকে সত্যবাদীর উপাধি দিয়েছিল, এবং যিনি বলেছিলেন,

'আমি তোমাদের মধ্যে এক সুদীর্ঘ জীবন যাপন করিয়াছি।'

(ইউনুস: ১৭)

আমি তোমাদের মাঝে নিজের জীবন অতিবাহিত করেছি। তোমরা কি আমার কোনও মিথ্যা প্রমাণ করতে পার? তাঁর জাতি কোনও আপত্তি করে নি। এঁদের ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে আরও হাজার হাজার সত্যবাদী ও পুণ্যবানরা পৃথিবীতে এসেছেন, যাঁরা একস্বরে স্বীকার করেছেন যে এক খোদা রয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা এও বলেন যে, তাঁরা খোদার সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং তাঁ র সঙ্গে বার্তালাপের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তাবড় তাবড় দার্শনিক, যারা পৃথিবী জোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন, তারা এঁদের মধ্যে কোনও একজনের কীর্তির এক সহস্রাংশও উপস্থাপন করতে পারবে না। বরং সেই সব দার্শনিকদের জীবনের যদি তুলনা করা হয়, তবে দেখা যাবে যে তাদের জীবনে কথার তুলনায় কাজের খাতা অত্যন্ত ফাঁকা ফাঁকা। পুণ্যবানরা যে নিষ্ঠা ও সততা প্রদর্শন করেছে, তা দার্শনিকরা কোথা থেকে দেখাতে পারে? এরা মানুষকে সত্যের শিক্ষা দেয়, কিন্তু নিজেরা মিথ্যা থেকে বিরত হয় না। এর বিপরীতে উপরোক্ত ব্যক্তিরা কেবল সত্যের কারণে শত সহস্র কষ্ট সহন করতে থেকেছেন, কিন্তু কখনও তাদের পদস্খলন হয় নি। তাদেরকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে, দেশান্তরিত করা হয়েছে, বাজারে বন্দরে অপমানিত করার চেষ্টা করা হয়েছে, সারা জগত তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেকিন্তু তবুও তারা নিজেদের কথা থেকে পিছিয়ে আসেন নি। আর কখনও মানু ষের ভয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করার মত হীনতা প্রদর্শন করেন নি। তাঁদের কর্ম পন্থা, জগতবিমুখতা, প্রদর্শনবিমুখতা একথা প্রমাণ করেছে যে, তাঁরা ছিলেন নিঃস্বার্থ; তাদের কোন কাজের পিছনে কোন প্রকার স্বার্থ জড়িত ছিল না। তবে এমন সত্যবাদী এবং বিশ্বস্তের দল যখন একস্বরে বলছে যে, তারা আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সাক্ষাত করেছে, তাঁর কণ্ঠ শুনেছে এবং তাঁর ঝলক দেখেছে, তবে তাদের কথাকে অস্বীকরার উপায় কি? যাদেরকে আমরা প্রতিদিন মিথ্যা বলতে শুনি, তাদেরও কতক যদি একত্রিত হয়ে কোনও বিষয়ের জন্য সাক্ষ্য দেয়, তবে আমাদেরকে স্বীকার করতে বাধ্য হতে হয়। যাদের সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণরূপে অনবহিত, তারা যখন পত্রিকায় নিজেদের গবেষণা প্রকাশ করে, আমরা অনায়াসে তা মেনে নিই। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি না কেবল এই সব সত্যবাদীদের কথাগুলিকে। দুনিয়ার মানুষ বলে, লন্ডন নামে এক শহর আছে, আমরা তা মেনে নিই। ভূগোলবিদরা লেখে, আমেরিকা একটি মহাদেশ আর আমরা তা সত্য বলে মেনে নিই। পর্যটকরা বলে, সাইবেরিয়া এক সুবিশাল জনমানবশূন্য অঞ্চল, আমরা সে কথা অস্বীকার করি না কেন? কারণ, এ বিষয়ে অনেকেরই সাক্ষ্য প্রমাণ মজুদ আছে। অথচ আমরা সেই সব সাক্ষীর জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে কিছুই জানি না যে তারা সত্য লিখেছে নাকি মিথ্যা। কিন্তু যাদের সত্যতা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট, যারা নিজেদের প্রাণ ও সম্পদ, স্বদেশ ও সম্মান সব কিছু বিসর্জন দিয়ে পৃথিবীর বুকে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের বিষয়ে চাক্ষুষ সাক্ষ্যদানকারী সেই সব মানুষের কথাগুলিকে অবিশ্বাস করা এবং এই সব পর্যটক ও ভূগোলবিদদের কথা মেনে নেওয়া কোথাকার সততা? যদি কয়েকজন ব্যক্তির কথা শুনে লন্ডনের অস্তিত্বপ্রমাণ হতে পারে, তবে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব হাজার হাজার সত্যবাদীর সাক্ষ্যের মাধ্যমে কেন প্রমাণিত হতে পারে না মোটকথা যে সব হাজার হাজার ব্যক্তি নিজেদের সাক্ষাৎ দর্শন খোদা তা'লার অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়, তাদের সাক্ষ্য কোনভাবেই প্রত্যাখ্যানযোগ্য হতে পারে না। আশ্চর্যের বিষয় হল, যারা এই পথ দিয়ে গেছে, তারা তো সকলেই একস্বরে বলছে, খোদা আছেন, কিন্তু যারা আধ্যাত্মিকতার অলিগলি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অনবহিত, তারা বলে, এঁদের কথা বিশ্বাস করো না যে খোদা বলে কেউ আছে। অথচ সাক্ষ্যপ্রমাণের নীতি অনুযায়ী দুই জন সম মর্যাদার সত্যবাদী ব্যক্তির কোন একজনও যদি একটি বিষয়ে সাক্ষী দিয়ে থাকে, তবে যে বলে যে সে অমুক জিনিস দেখেছে, তার সাক্ষীকে সেই ব্যক্তির সাক্ষীর উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে যে বলে সে এই জিনিসটি দেখেনি। কেননা, এটি সম্ভব যে, তাদের মধ্যে একজনের দৃষ্টি সেটির উপর পড়েনি, কিন্তু এটি অসম্ভব যে, একজন দেখে নি অথচ মনে করে বসল যে সে দেখেছে। অতএব খোদাকে দর্শনকারীর সাক্ষ্য এর বিরোধীদের উপর অকাট্য এক যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করে।

তৃতীয় দলিল

তৃতীয় দলিল যা কু রআন শরীফ থেকে জানা যায়, সেটি হল এই মানব প্রকৃতি নিজেই খোদা তা'লার অস্তিত্বের একটি প্রমাণ। কেননা কিছু পাপকর্ম এমন আছে, যেগুলিকে মানু ষ প্রবৃত্তিগতভাবেই অপছন্দ করে–যেমন মা, বোন এবং কন্যার সঙ্গে ব্যাভিচার, মল–মূত্র এবং এই প্রকারের নোংরা বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক করা, মিথ্যা এবং আরও অনেক কিছু। এগুলি এমন বিষয় যা থেকে নাস্তিকরাও বিরত থাকে। কিন্ত কেন? যদি কোনও খোদা না থাকেন, তবে কেন? সে কেনই বা মা–বোন এবং অন্যান্য নারীর মাঝে তারতম্য করে আর মিথ্যাকে অপছন্দ করে। এর পিছনে কোন্ যুক্তি কাজ করে যে, উপরোক্ত জিনিসগুলি তার দৃষ্টিতে গর্হিত হিসেবে গণ্য হয়? যদি কোনও অদ্বিতীয় ও পরম শক্তির প্রতাপ অন্তরকে ত্রস্ত না করে, তবে কেন এর থেকে বিরত থাকে? তার জন্য তো সত্য, মিথ্যা আর ন্যায় এবং অন্যায় সব সমান, সে যা খুশি করতে পারে। সেটি কোন বিধান যা তার সুপ্ত অনু ভু তির উপর রাজত্ব করে, যে তার অন্তরকে সিংহাসন বানিয়ে রেখেছে? তাই নাস্তিক বলে জিহ্বা তাঁর রাজত্ব থেকে বেরিয়ে গেলেও তাঁর সৃষ্ট প্রবৃত্তি তথা সহজাত বৈশিষ্ট্যরাজত্ব থেকে বের হয়ে যেতে পারে না। পাপ এড়িয়ে চলা কিম্বা তা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা তার জন্য একটি দলিল যে, কোনও রাজাধিপতির কাছে জবাবদিহির ভয় আছে যা তার অন্তরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যদিও সে তাঁকে রাজাধিপতি হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করে। কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

"না, আমি কিয়ামত দিবসের কসম খাইতেছি। পুনরায় (বলিতেছি) না, আমি পুনঃপুন: ভর্ৎসনাকারী আত্মার কসম খাইতেছি, (যে কিয়ামত দিবসে অবশ্যম্ভাবী)"(আল কিয়ামাহ, ২–৩)

অর্থাৎ যেমনটি মানুষ মনে করে যে খোদাও নেই আর কর্মফল ও শাস্তি বলেও কিছু নেইএমনটি মোটেই নয়। বরং এই বিষয়ের সাক্ষ্যের জন্য আমরা দুটি জিনিষ উপস্থাপন করছি। একটি হল এই যে, প্রত্যেক বিষয়ের জন্য একটি কিয়ামতের দিন নির্ধারিত আছে, যেদিন তার বিচার হয় আর পুণ্যের প্রতিদান পুণ্য ও পাপের প্রতিদান শাস্তি ভোগ করতে হয়। যদি খোদা না থাকেন, তবে প্র তিদান ও শাস্তি ভোগ কেন করতে হচ্ছে? আর যারা কিয়ামতে কুবরা বা বৃহত্তর কিয়ামতকে অস্বীকার করে, তারা দেখুক যে কিয়ামত তো এই পৃথিবী থেকেই শুরু হয়ে যায়। ব্যাভিচারীর গনোরিয়া ও সিফিলিস রোগ হয়, বিবাহিত পুরুষের তো এই রোগ হয় না। অথচ উভয়ে একই কাজ করে। দ্বিতীয় সাক্ষ্য 'নফসে লাওয়ামা' তথা তিরস্কারকারী আত্মা। অর্থাৎ মানুষের আত্মা নিজেই এমন পাপকর্মকে ধিক্কার জানিয়ে বলে, এটি অত্যন্ত জঘন্য ও নোংরা। একজন নাস্তি ক ব্যক্তিও ব্যাভিচার এবং মিথ্যাকে ঘৃণার চোখে দেখে। সে অহংকার এবং বিদ্বেষকে পছন্দ করবে না। কিন্তু কেন? তাদের কাছে তো কোনও শরিয়ত বা ঐশীবিধান নেই। এজন্য নয় যে সেটিকে তার মন অপছন্দ করে, আর তার অপছন্দের কারণ হল এই অপকর্মে র কারণে এক পরম বিচারকের কাছ থেকে সে শাস্তি পাবে। যদিও ভাষায় সে তা প্রকাশ করতে পারে না। এই বিষয়ের সমর্থনে কুরআন মজীদের আরও একটি স্থানে বলা হয়েছে–

"অতঃপর তিনি ইহার প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন– উহার মন্দ পথ এবং উহার তাকওয়ার পথ।"

(আশশামস: ৯)

আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক হৃদয়ে পুণ্য ও পাপের প্রেরণা সঞ্চার করেছেন। কাজেই পুণ্য ও পাপের চেতনাই খোদার অস্তিত্বের এক

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সদকা কখনও কারো সম্পদ হ্রাস করে নি আর আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা দানের কারণে বান্দার সম্মান বৃদ্ধিই করে থাকেন।

(সহী মুসলিম, কিতাবুর বির ওয়াসসিলাহ ওয়াল আদাব)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and family, Barisha (Kolkata)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)

অসাধারণ দলিল। যদি খোদা না থাকেন তবে কোনও বিষয়কে পুণ্যের আর কোনওটিকে পাপের বলার কোনও কারণ নেই। মানুষের যা খুশি করুক, তাতে কি এসে যায়?

চতুর্থ প্রমাণ

খোদাতা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে চতুর্থ যে দলিলটি কুরআন থেকে জানা যায় সেটি হল–

"এবং এই যে, নিশ্চয় (সকল বিষয়ের) পরিসমাপ্তি তোমার প্রতিপালকের নিকট ঘটে;এবং এই যে তিনিই হাসান এবং কাঁদান; এবং এই যে, তিনিই মৃত্যু ঘটান এবং জীবন দান করেন; এবং এই যে, তিনিই সৃষ্টিকরেন জোড়া জোড়ানর ও নারী, শুক্র বিন্দু হইতে যখন ইহা (জরায়ুতে) নির্গত করা হয়।

(আন নাজাম: আয়াত: ৪৩–৪৭)

অর্থাৎ এই বিষয়টি আমরা প্রত্যেক নবীর মাধ্যমে পোঁছে দিয়েছি যে, প্রত্যেকটি জিনিসের পরিসমাপ্তি খোদা তা'লার সত্তায়। সেটি আনন্দ উপলক্ষ্য হোক বা দুঃখের কোনও ঘটনা হোক–খোদার পক্ষ থেকেই তা আসে। জন্ম, মৃত্যু, সব তাঁরই হাতে। তিনিই নারী ও পুরুষ উভয়কে সৃষ্টি করেছেন, একটি তুচ্ছ বস্তু থেকে, যে সময় তা, তা প্রবেশ করানো হয়।

এই আয়াতগুলিতে আল্ল াহ্ তা'লা মানুষকে এবিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, প্রত্যেক ক্রিয়ার একজন কর্তা থাকে। প্রত্যেক কর্মের কর্তা থাকাও আবশ্যক। অতএব এই সমগ্র বিশ্ব–ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখ, এর থেকে অবশ্যই তোমার এবিষয়ের প্রতি পথ–নির্দেশনা হবে যে, সমস্ত বিষয় অবশেষে খোদার সত্তায় এসে সমাপ্ত হয়। তিনিই সমস্ত কিছুরই পরমনবিন্দু, তাঁর নির্দেশেই সবকিছু পরিচালিত হচ্ছে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে তার প্রারম্ভিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, 'তোমাদের জন্ম হয়েছে এক বিন্দু শুক্রাণু থেকে আর তোমরা যত পিছনে ফিরে দেখবে, ক্রমশ ততই তুচ্ছ হতে থাকবে। তবে তোমরা কিভাবে নিজেই নিজের স্রষ্টা হতে পার, যখন কিনা স্রষ্ট ভিন্ন কোনও সৃষ্টি হতে পারে না। আর মানুষ কখনওই নিজেকে সৃষ্টি করে নি। কেননা, মানুষের সামগ্রিক অবস্থা নিয়ে যতই চিন্তা করে দেখবে, ততই স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে মানুষ এক তুচ্ছ ও এবং নগণ্য অবস্থা থেকে উন্নতি করতে করতে এই অবস্থায় পোঁছেছে। আর সে যখন বর্তমান অবস্থাতেই স্রষ্টা নয়, তবে সেই দুর্বল অবস্থায় কিভাবে স্রষ্টা হতে পারত? কাজেই স্বীকার করতে হবে যে, তার স্রষ্টা অন্য কেউ, যার শক্তি অসীম এবং মহিমা নিরন্তর। মোটকথা, মানুষের বিবর্তন সম্পর্কে যতই চিন্তা করবে, তার কারণগুলি সূক্ষ্মথেকে সূক্ষ্মতর হতে থাকবে এবং অবশেষে একস্থানে এসে সমস্ত জাগতিক জ্ঞান পরাজয় স্বীকার করে বলে, 'এতে আমাদের আর কোনও হাত নেই। আমরা জানি না এমনটি কেন হল?' আর এটিই সেই স্থান যেখানে আল্লাহ্ তা'লার হাত কাজ করে আর প্র ত্যেক বিজ্ঞানীকে অবশেষে স্বীকার করতে হয় যে, 'ইলা রাব্বিকাল মুনতাহা'। অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিষ এমন এক সত্তায় এসে সমাপ্ত হয় যেটিকে সে নিজের বুদ্ধির গণ্ডিতে আনতে পারে না আর তিনিই খোদা। এটি একটি স্থুল প্রমাণ যা একজন অজ্ঞ ব্যক্তিও অনুধাবন করতে পারে।

কথিত আছে যে কোনও এক ব্যক্তি এক বেদুইনকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে তোমার কাছে কি প্রমাণ আছে যে খোদা আছেন। সে উত্তর দিয়েছিল যে, জঙ্গলে উটের বিষ্ঠা দেখে বলে দেওয়া যায় যে এখান দিয়ে উট অতিক্রম করেছে। তবে এমন সুবিশাল সৃষ্টিজগত দেখে কি আমি জানতে পারব না যে এর কোনও একজন প্রকৃত স্রষ্টা আছেন? এই উত্তর ছিল সত্যিকার এবং মানুষের প্রকৃতিসম্মত। আর সৃষ্টিজগতের অস্তিত্ব লাভের প্রতি যদি মানুষ দৃষ্টি দেয়, তবে এক সত্তাকে স্বীকার করতে হয় যিনি এই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।

পঞ্চম দলিল

আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে কুরআন শরীফ যে পঞ্চম দলিল দিয়েছে তা ঐ প্রকারেরই, কিন্তু তার থেকেও বেশি শক্তিশালী। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন

"পরম বরকত ও কল্যাণময় তিনি, যাঁহার হাতে সকল আধিপত্য, এবং তিনিই সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান; যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্যুকে এবং জীবনকে যেন তিনি তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন–তোমাদের মধ্যে কে কর্মে উত্তম; এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতীব ক্ষমাশীল; যিনি স্তরে স্ত রে সৃষ্টি করিয়াছেন সাত আকাশ। তু মি রহমান আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইবে না। অতঃপর তুমি পুনরায় দৃষ্টি নিবদ্ধ কর। তুমি কি কোন ত্রুটি –বিচ্যুতি দেখিতে পাও? অতঃপর তুমি পুনঃপুনঃ দৃষ্টি নিবদ্ধ কর, (পরিশেষে তোমার) দৃষ্টি ব্যর্থ হইয়া তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে এমতাবস্থায় যে উহা অতি শ্রান্ত–ক্ল ান্ত হইবে (তবু কোন প্রকার অসামাঞ্জস্য দেখিতে পাইবে না)।

(আলমুল্ক: ২–৫)

অনেকে বলে, এই বিশ্ব – ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বলাভ সমাপতনের ফল। পদার্থ আপনা আপনি সৃষ্টি হয়ে সব কিছু তৈরী হয়েছে আর বিজ্ঞান থেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, হতে পারে , পৃথিবী নিজে থেকেই যুক্ত হয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘুরে চলেছে, এটিকে কেউ ঘোরাচ্ছে না। কিন্তু তাদেরকে আল্ল াহ তা'লা এই উত্তর দিচ্ছেন যে, দৈবাৎক্রমে যুক্ত হওয়ার জিনিসের মধ্যে কখনও কোনও ধারাবাহিকতা ও বিধিনিয়ম থাকে না, বরং কেবল থাকে অনাসৃষ্টি। বিভিন্ন রঙ পরস্পর মিলিত হয়ে একটি চিত্র তৈরী হয়। কিন্তু যদি বিভিন্ন রঙ একটি কাগজের উপর ছিটিয়ে দেওয়া হয়,তবে কি সেটি কোনও ছবি তৈরী হয়ে যাবে? ইট দিয়ে বাড়ি তৈরী হয়, কিন্তু অগোছালোভাবে একটির উপর আরেকটি ফেলে দিলে বাড়ি তৈরী হয়ে যাবে? তর্কের খাতিরে যদিও মেনেও নিই যে, অনেক ঘটনা দৈবাৎক্রমেও ঘটে থাকে। কিন্তু বিশ্ব–ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মকানুন প্রণিধান করার পর কি কেউ কখনও বলতে পারে যে, এগুলি সব আপনা আপনিই হয়েছে। একথা না হয় মেনে নিলাম যে পদার্থ থেকে পৃথিবী তৈরী হয়েছে এও ধরে নিলাম যে দৈবাৎক্রমেই মানু ষের সৃ ষ্টি হয়েছে। কিম্বা মানুষের গঠনপ্রণালীর দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখ, এমন নিখুঁত ও পরিপূর্ণ সৃষ্টি কখনও নিজে থেকে হতে পারে? পৃ থিবীর নিয়মে সচরাচর একটি বৈশিষ্ট্য দেখে তৎক্ষণাৎ তার কারিগর সম্পর্কে বলে দেওয়া যায়। একটি সুন্দর ছবি দেখে তৎক্ষণাৎ ধারণা জন্মে যে কোনও এক চিত্রকার এটি এঁকেছে। সু ন্দর হাতের লেখা দেখে বোঝা যায় যে কোনও পারদর্শী লিপিকার এটি লিখেছে। এরপর যতই সম্পর্ক বাড়ে, ততই কারিগর বা লেখকের গুণ ও বড়ত্ব স্মৃতিতে গেঁথে যায়। তবে এমনটি কেন ধারণা করা হয় যে এমন এক সুব্যবস্থিত পৃথিবী নিজেই থেকেই তৈরী হয়ে গেছে? এবিষয়েও একটুখানি ভেবে দেখ যে, যেখানে মানুষের মধ্যে উন্নতি করার শক্তি রয়েছে, তেমনিভাবে তাকে নিজের চিন্তাভাবনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য বুদ্ধি দেওয়া হয়েছে এবং তার শরীরকেও সেভাবে তৈরী করা হয়েছে। যেহেতু তাকে পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতে হত, এইজন্য তার মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্য রাখা হয়েছে যাতে হাঁটা চলা করে উপজীব্য উৎপাদন করে। গাছের খাদ্য মাটিতে রয়েছে, তাই একে শিকড় দেওয়া হয়েছে, যাতে এর মাধ্যমে নিজের খাদ্যের চাহিদা পূর্ণ করতে পারে। বাঘের খাদ্য যেহেতু মাংস, তাই তাকে শিকার করার জন্য নখ দেওয়া হয়েছে। আর ঘোড়া এবং গরুর জন্য খাদ্য হিসেবে ঘাস নির্ধারণ করা হয়েছে, যে কারণে তাদেরকে এমন গ্রীবা দেওয়া হয়েছে যা মাথানীচু করে ঘাস চরতে পারে। আর উটের জন্য গাছের পাতা এবং কাঁটাযুক্ত লতাপাতা খাদ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে, যে কারণে তাদের গ্রীবা দীর্ঘ। এই সব কার্যপ্রণালী কি নেহাত সমাপতনের ফল। সমাপতন আগে থেকেই কি জেনে নিয়েছিল যে উটকে দীর্ঘ গ্রীবা দিতে হবে, বাঘকে থাবা, গাছকে শিকড় এবং মানুষকে পা দিতে হবে? এটি কি বোধগম্যের মধ্যে পড়তে পারে যে আপনা আপনিই সৃষ্ট জিনিষের মধ্যে এমন সুচারু ব্যবস্থাপনা থাকবে। মানুষকে যে ফুসফুস দেওয়া হয়েছে তার জন্য বায়ুও সৃষ্টি করা হয়েছে। তার জীবন যেহেতু পানির উপর নির্ভরশীল, তাই সূর্যের রশ্মির মাধ্যমে মেঘের দ্বারা তাকে পানি সরবরাহ করা হয়েছে। চোখ দেওয়া হয়েছে আর তা ক্রীয়াশীল থাকার জন্য সূ র্যে র আলোও দেওয়া হয়েছে যাতে সে দেখতে পায়। কান দেওয়া হয়েছে আর সঙ্গে সুন্দর কণ্ঠও দেওয়া হয়েছে। জিহ্বা দিয়ে সুস্বাদু খাদ্যও দেওয়া হয়েছে। নাক তৈরী করা হয়েছে, সঙ্গে সুগন্ধও দেওয়া হয়েছে। মানুষের ফুসফুস দৈবক্রমে সৃষ্টি

যুগ ইমামের বাণী

খোদা তোমাদের সঙ্গে থাকবেন, যদি তোমরা মুত্তাকি হও এবং তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথসমূহে বিচরণ কর।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk.Fayjal Sb. and Family, Jaynagar, Bankura, WB

মহান আল্লাহ্র বাণী

তুমি বল, 'হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ্! তুমি যাহাকে চাহ রাজত্ব দান কর এবং যাহার নিকট হইতে চাহ রাজত্ব কাড়িয়া লও।

(আলে ইমরান:২৭)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa Sb., Berhampur, Murshidabad

হওয়া সম্ভব ছিল, কিন্তু তার জন্য বায়ুর উপকরণ কিভাবে সৃষ্টি হত?

কিন্তু এটি অদ্ভুত সমাপতন ছিল যা লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে গিয়ে একটি সূর্য তৈরী করে দিল যাতে নিজের কাজ করতে পারে। একদিকে সমাপতন যদি কান তৈরী করেছিল, তবে অপরদিকে কোন শক্তি ছিল যা সুন্দর কণ্ঠ তৈরী করেছিল। ধরে নিলাম যে হিমের দেশে মেরু ভালুক বা কুকুর সৃষ্টি কাকতালীয় ছিল, কিন্তু কিভাবে সেই সব কুকুর ও ভালু কের লোমগুলি এত দীর্ঘ হয়ে উঠল যাতে তারা শীতের হাত থেকে রক্ষা পায়? কাকতালীয়ভাবেই হাজার হাজার রোগব্যাধি সৃষ্টি হয়েছে আর সেই কাকতালীয়ভাবেই সেগুলির চিকিৎসা তৈরী হয়েছে। কাকতালীয়ভাবে বিছুটি তৈরী হয়েছে, যা স্পর্শ করলে চুলকানিও জ্বালা শুরু হয়ে যায়। আর কাকতালীয়ভাবেই পালংশাক তৈরী হয়েছে যা তার প্রতিষেধক হতে পারে। নাস্তিকদের সন্নিপাতও বেশ উদ্ভট। যে সমস্ত জিনিসের জন্য মৃত্যুর বিধান আছে, সেগুলির সঙ্গে জন্মেরপরম্পরাও প্রতিষ্ঠিত রেখেছে। আর যে সমস্ত জিনিসের সঙ্গে মৃত্যুর সম্পর্ক নেই, সেগুলির সঙ্গে কোনও অনুক্রমই রাখা হয় নি। মানুষ জন্ম নেওয়ার পর যদি তার মৃত্যু না হত, তবে কয়েক বছরের মধ্যে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত। এই কারণেই মানুষের সঙ্গে মৃত্যুকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সূর্য, চাঁদ ও পৃথিবী– এরা নতুনভাবে জন্মও নেয় না আবার ধ্বংসও হয়ে যায় না। এই শৃঙ্খলাও কি কম আশ্চর্যজনক যে পৃথিবী ও সূর্যে যেহেতু অভিকর্ষ বল রয়েছে, তাই তাদেরকে পরস্পর থেকে এতটা দূরত্বে রাখা হয়েছে যাতে সংঘর্ষ না হয়। এই বিষয়গুলি কি একথা প্রমাণ করছে না যে এই সব জিনিষের সৃষ্টিকর্তা তিনিই যিনি কেবল সর্বজ্ঞানীই নন,বরং অসীম জ্ঞানী। তাঁর নিয়ম-কানুন এমন সুশৃঙ্খল যে, সেগুলির মধ্যে কোনও প্রকার স্ববিরোধ নেই, কোনও ত্রুটি নেই। আমার কাছে তো নিজের আঙুল গুলিও তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ বলে মনে হয়। আমাকে যেখানে জ্ঞান দান করা হয়েছে, যদি আমার বাঘের থাবা থাকত, সেগুলি দিয়ে কি আমি লিখতে পারতাম? বাঘকে জ্ঞান দেওয়া হয়নি, তাকে থাবা দেওয়া হয়েছে। আমাকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে আর লেখার জন্য আঙুল দেওয়া হয়েছে।

কোনও একটি সাম্রাজ্যে হাজার হাজার বুদ্ধিজীবি ও চিন্তাবিদ পরিচালন ব্যবস্থ াকে ত্রুটিমুক্ত করতে দিবারাত্র মগ্ন থাকে। কিন্তু তবু আমরা দেখি, তাদের দ্বারা এমন সব ভুল সাধিত হয় যা সাম্রাজ্যের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে থাকে। এমনকি অনেক সময় তাকে ধ্বংস পর্যন্ত করে দেয়। কিন্তু পৃথিবীর কাণ্ডকারখানা যদি কেবল সন্নিপাতের উপর নির্ভ র করে পরিচালিত হয়, তবে হাজার হাজার মস্তিষ্ক যেখানে ভুল করে, সেখানে আশ্চর্য হতে হয় যে এই সন্নি পাত কখনও কোনও ভু ল করে না। আসল কথা এই যে, এই ব্রহ্মাণ্ডের একজন স্রষ্টা আছেন, যিনি এই সুবিশাল ও সুবিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ডের মালিক এবং প্রতিপত্তির অধিকারী। যদি তিনি না থাকতেন তবে এই ব্যবস্থাপনা দেখা যেত না। এখন যেদিকে পার দৃষ্টি দিয়ে দেখ, কুরআন করীমের উক্তি অনুসারে তোমাদের দৃষ্টি হতাশ ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে আর প্রতিটি জিনিসের মধ্যে একটি সুচারু ব্যবস্থাপনা দেখতে পাবে। পুণ্যবানরা প্রতিদান পাচ্ছে আর পাপাচারীরা শস্তি পাচ্ছে। প্রতিটি জিনিস নিজের নির্ধ ারিত কাজ করে চলেছে, এক মুহূর্তের জন্যও বিরাম নিচ্ছে না। এটি ব্যপক বিষয়, কিন্তু আমি এখানেই শেষ করছি। বুদ্ধিমানদের জন্য ইঙ্গিতই যথেষ্ট।

ষষ্ঠদলিল

কুরআন শরীফ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'লাকে অস্বীকারকারীরা চিরকাল অপদস্ত ও বিফলমনোরথ হয়ে থাকে আর এও প্রমাণ করে যে তারা মিথ্যার উপর রয়েছে। কেননা আল্ল াহ্ তা'লা মান্যকারীদেরকে সবসময় বিজয় দান করে থাকেন আর তিনি নিজ বিরুদ্ধবাদীদের উপর বিজয়ী থাকেন। যদি কোনও খোদা না থাকেন,তবে এই সাহায্য ও সমর্থন কোথা থেকে আসে? লক্ষ্য করুন, মূসা সম্পর্কে ফিরাউন বলেছিল তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।' সুতরাং আল্লাহ্ তাহাকে পরকাল এবং ইহকালের আযাবে ধৃত করিলেন।

(আন নাযিয়াত: ২৫-২৬)

অর্থাৎ যখন হযরত মূসা (আ.) তাকে আল্লাহ্র আনুগত্য করার জন্য বললেন, তখন সে দাম্ভিকতা সহকারে উত্তর দিল, খোদা কেমন আবার, আমিই তো খোদা। কাজেই খোদা তা'লা এই জগতেও এবং পরজগতেও তাকে লাঞ্ছিত করলেন। ফিরাউনের ঘটনা একটি স্পষ্ট প্র মাণ যে, কিভাবে খোদার অস্বীকারকারীরা অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হতে থাকে। এছাড়াও পৃ থিবীতে কখনও কোনও নাস্তিক কোনও সাম্রাজ্য গড়ে তোলে নি। বরং পৃথিবীতেবিজয়ী এবং দেশের সংস্কারক এবং ইতিহাস সৃষ্টিকারী তারাই, যারা খোদাতে বিশ্বাসী। তাদের লাঞ্ছনা এবং জাতি হিসেবে পৃথিবীর সামনে আত্মপ্রকাশ না করার কি কোনও অর্থ নেই?

সপ্তম দলিল

আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের সপ্তম দলিলটি হল এই যে, আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপনকারীরা, তাঁর উপর ঈমান আনয়নকারীরা সব সময় সফল হয়। আর মানু ষের বিরোধীতা সত্ত্বেও তাদের উপর কোনও প্রকার বিপদ আপতিত হয় না। খোদা তা'লার অস্তিত্বের প্রচারক প্রত্যেক দেশে জন্ম নিয়েছেন। তাঁদের যত বিরোধিতা হয়েছে, ততটা আর কারো হয় নি। কিন্তু জগত তাদের কি ক্ষতি করতে পেরেছে? যারা রামচন্দ্রকে বনবাসে পাঠিয়েছিল, তারা কি সুখ লাভ করেছিল? আর রাবণ কোনও সুখ লাভ করেছিল? রামচন্দ্রের নাম কি হাজার হাজার বছরের জন্য অমর হয়ে যায় নি? আর রাবণের নাম চিরতরে কালিমালিপ্ত হল না? আর কৃষ্ণের নির্দে শ প্রত্যাখ্যান করে কৌরবদের কি লাভ হয়েছিল? তারা কি কু রুক্ষেত্র ময়দানে পর্যদুস্থ হয় নি? ফিরাউন বাদশাহ যে কি না বনী ইসরাঈল জাতির লোকদেরকে ইট গাঁথানোর কাজে লাগাত, সে মুসার মত অসহায় মানুষের বিরোধীতা করল, কিন্তু মুসার কি কোনও ক্ষতি করতে পারল? সে সলিল সমাধি নিল আর মূসা সম্রাটের আসনে আসীন হলেন। পৃথিবীর মানুষ হযরত মসীহ্ (আ.)এর যে বিরোধীতা করেছিল, তাও কারো অজানা নয় আর তাঁ র যে উন্ন তি হয়েছে, সেটিও দিবালোকের নয় স্পষ্ট। তাঁর শত্রুরা তো ধ্বংস হয়েছেই, তাঁর অনুগামীরা দেশের সম্রাট হয়ে উঠেছেন। আমাদের প্রভুও পৃথিবীতে সব থেকে বেশি সেই পবিত্র সত্তার নাম প্রচার কছিলেন। ইউরোপের এক লেখকের মতে,'খোদার জন্য তাঁর উন্মদনা ছিল।' (নাউযুবিল্লাহ) সব সময় খোদার নাম যপতেন। সাতটি জাতি তাঁর বিরোধিতা করেছিল। আপন পর সকলে তাঁর বিরোধিতায় নেমে এসেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁর হাতে কি পৃথিবীর সম্পদ ধরা দেয় নি? যদি খোদা না থাকেন, তবে এই সমর্থন কে করল? এই সব কিছু ই যদি কাকতালীয় হত তবে কেউ খোদার ঈশ্বরত্ব প্রমাণের জন্য আবির্ভূত হত আর উল্টো জগতবাসী তাকে লাঞ্ছিত করত। কিন্তু খোদার নাম মহিমামণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে যেই দণ্ডায়মান হয়েছে, সে বিশিষ্ট সম্মান ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে বলেছেনএবং যে কেউ আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং মোমেনদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, (স্মরণ রেখো) এই খোদার মান্যকারীরাই জয়যুক্ত হয়ে থাকে।

(আলমায়েদা: ৫৭)

অষ্টম দলিল

কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'লার তাঁর অস্তিত্বের যে অষ্টম দলিলটি প্রদান করেছেন তা হল তিনি দোয়া কবুল করে থাকেন। মানুষ যখন ভীত ও ব্যকুল হয়ে তাঁর কাছে দোয়া করে, তিনি তখন সেই দোয়া কবুল করেন। আর এটি বিশেষ কোনও যুগের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, বরং প্রত্যেক যুগে এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা যায়। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে বলেন

"আমার বান্দারা যখন আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তখন তুমি তাদের বলে দাও, আমি রয়েছি তাদের কাছেই। প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা শুনি যখন সে আমাকে ডাকে। কাজেই তারও উচিত আমার কথা শোনা এবং আমার উপর ঈমান আনা, যাতে সে হিদায়ত পায়। (ইব্রাহিম: ২৮)

এখন যদি কোনও ব্যক্তি বলে, কিভাবে জানা যাবে যে খোদা শোনেন। কিছু কিছু দোয়ার কাজ কাকতালীয়ভাবে সংঘটিত হয়েছে, এমনটি কেনই বা বলা

যুগ খলীফার বাণী

প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। এবং নিশ্চয় কিয়ামতের দিনই কেবল তোমাদিগকে তোমাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে। (আলে ইমরান: ১৮৬)

দোয়াপ্রার্থী: Humayun Kabir Molla, Nalhati, Birbhum

মহান আল্লাহ্র বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdur Rahaman Sb. Berhampur, Murshidabad

যাবে না? যেমনটি আবার অনেকের হয়ও না। যদি সমস্ত দোয়া কবুল হত তবু কিছু একটা বলা যেত। কিন্তু মাত্র কয়েকজনের দোয়া কবুল হওয়াতে কিভাবে জানা গেল যে এটি সন্নিপাত বা সমাপতন ছিল না, কেউ এটি গ্রহণ করেছে? এর উত্তর হল, দোয়ার গ্রহণীয়তার সঙ্গে একটি নিদর্শন থাকে।

যেমনটি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেছিলেন, কয়েক জন মুমূর্ষু রুগীকে বেছে নিয়ে তাদেরকে দুটি দলে বিতরণ করে নেওয়া হোক। একটি দলের চিকিৎসা ডাক্তার করুক।

অপরদিকে আমার ভাগের রুগীদের জন্য আমি দোয়া করব। তার পর দেখ যে কার ভাগের রুগী সুস্থ হয়। এখন বলুন, এই ধরণের পরীক্ষায় কোনও সন্দেহ থাকতে পারে কি? এরপর একজন জলাতঙ্কের রোগী, যার চিকিৎসার জন্য ডাক্তারেরা তৎক্ষণাত অস্বীকার করেছিল এবং লিখে দিয়েছিল যে এর কোনও চিকিৎসা নেই, তার জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) দোয়া করেন আর সে সুস্থ হয়ে যায়। অথচ পাগল কুকুরের কামড়ে পাগল হয়ে যাওয়া মানুষ কখনই সুস্থ হয় না।

অতএব দোয়ার কবুলীয়াত একথার প্রমাণ যে, কোনও এক সত্তা আছেন, যিনি মানুষের দোয়া শোনেন। আর দোয়ার গ্রহণীয়তা কোনও বিশেষ যুগের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, প্রত্যেক যুগে এর নমুনা পরিলক্ষিত হয়। যেমনটি অতীতে দোয়া গৃহীত হয়েছে, তদনুরূপ বর্তমানেও হয়ে থাকে।

নবম দলিল

কুরআন শরীফ থেকে আল্লাহ তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে যে নবম দলিলটি জানা যায় তা যদিও আমি নয় নম্বরে লিখেছি, কিন্তু বাস্তবে তা নিশ্চিতভাবে অসাধারণ একটি দলিল যা খোদা তা'লার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেন–

"যাহারা ইমান আনিয়াছে, আল্লাহ্ এই স্থায়ী বাক্য দ্বারা তাহাদিগকে ইহজগতে স্থায়িত্ব দান করেন এবং পরজগতেও।

(ইব্রাহিম: ২৮)

অতএব প্রত্যেক যুগেই আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু তাঁর বহু বান্দাদের সঙ্গে বার্তালাপ করেন, সেক্ষেত্রে এটা কিভাবে অস্বীকার করা যেতে পারে? আর কেবল যে আম্বিয়া ও রসূলদের সঙ্গেই বার্তালাপ করেন তা নয়, বরং আওলিয়াদের সঙ্গেও কথা বলেন আর অনেক সময় এমন নিরীহ ব্যক্তির উপর তিনি করুণাবশত তাকে আশ্বস্ত করতে তার সঙ্গে কথা বলেন। এই অধমের সঙ্গেও তিনি কথা বলেছেন এবং নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, অনেক সময় তিনি যুক্তি প্রমাণের দ্বার রুদ্ধ করতে অত্যন্ত নোংরা প্রবৃত্তির মানুষের সঙ্গেও কথা বলেন। অনেক সময় তিনি মেথর,মুচিদেরকে পর্যন্ত সত্য স্বপ্ন এবং ইলহাম দান করেন। আর সেগুলি যে কো অতিপ্রাকৃত সত্তার পক্ষ থেকে তা এর থেকে প্রমাণ হয় যে, অনেক সময় তাদের উপর অদৃষ্টের সংবাদ উন্মোচিত হয়, যেগুলি যথাসময়ে পূর্ণ হয়ে প্রমাণ করে দেয় যে তা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি প্রসূত কিম্বা পরিপাক জনিত গণ্ডগোলের কারণে ছিল না। আর অনেক সময় শত শত বছরের পূর্বের সংবাদ বলে দেওয়া হয় যাতে কেউ একথা না বলতে পারে যে, বর্তমান ঘটনা স্বপ্নে সামনে এসেছে আর তা কাকতলীয়ভাবে পূর্ণ ও হয়ে গেছে। সুতরাং খৃষ্টান জাতির যে সব উন্নতি দেখে জগতবাসী এখন- আশ্চর্য হচ্ছে, সেগুলি তওরাত ও কুরআন করীমে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছিল, স্পষ্ট বাক্যে বিস্তারিতভাবে তা বর্ণিত হয়েছে। এমনকি সেই সকল ঘটনার উল্লেখও রয়েছে, যেগুলি ভবিষ্যতে ঘটবে। যেমন,'ইজাল ইশারু উত্তেলাত'

অর্থাৎ এমন এক সময় আসবে, যখন উট পরিত্যক্ত হয়ে পড়বে।' (তাকবীর:৫)

মুসলিমের হাদীসে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

وَلَيُتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعٰى عَلَيْهَا

অর্থাৎ উটের দ্বারা কাজ নেওয়া হবে না। বর্তমান যুগে রেলগাড়ি আবিষ্কারের মাধ্যমে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। রেলগাড়ি সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.)-এর বাণীতে এমন এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায় যেগুলি থেকে রেলগাড়ির চিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে আর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, নবীর বাণীতেও বাহনের ধারণা পাওয়া যেত যা জলীয়বাষ্প দ্বারা চালিত হবে, যার সম্মুখভাগে ধুঁয়ার পাহাড়

থাকবে আর বাহন হিসেবে সেটি গর্ধবসদৃশ হবে আর চলার পথে একটি শব্দ করবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

২) 'ইজাস সুহুফু নুশেরাত' (আততাকবীর: ১১) অর্থাৎ বইপুস্তক ও পত্র-পত্রিকা ব্যপকহারে প্রকাশিত হবে। বর্ত মান যুগে ছাপাখানা আবিষ্কারের ফলে বইপুস্তক যেমন ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়েছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

৩) 'ইজান নুফুসু জুওয়েজাত' (আত্তকবীর: ৮) অর্থাৎ মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ বৃদ্ধির উপকরণ এতটাই সহজললভ্য হয়ে উঠবে যে, বর্তমান যুগের থেকে অধিক তা কল্পনা করা যায় না।

৪) تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ

কম্পনশীল পৃথিবী কম্পমান হইবে, (এবং আর একটি পশ্চাদবর্তী (কম্পন) উহার অনুসরণ করিবে। (নাযিয়াত: ৬)

আর এই যুগটি এদিক থেকে বিশিষ্ট।

"এবং কোন জনপদ নাই যাহাকে আমরা কিয়ামত দিবসের পূর্বেই ধ্বংস করিব না অথবা উহাকে কঠোর আযাব দিব না।"

(বনী ইসরাইল: ৫৯)

এই যুগেই প্লেগ, ভূমিকম্প, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ এবং নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহে মানুষ নিহত হচ্ছে আর এই যুগে মৃত্যুর এতগুলি কারণ একত্রিত হয়েছে এবং তা এমন তীব্র আকারে, সামগ্রিকভাবে যার নজির অতীতের কোনও যুগে পাওয়া যায় না।

এছাড়াও ইসলাম এমন এক ধর্ম, যার প্রত্যেক শতাব্দীতে এর মান্যকারীদের মধ্যে এমন মানুষ জন্ম নিতে থাকে যারা ঐশী ইলহামে ধন্য হয়ে থাকেন এবং অলৌকিক নিদর্শন প্রকাশের মাধ্যমে জানিয়ে দেন যে আমাদের কল্পনাশক্তির উর্দ্ধে সর্বশক্তিমান এক সত্তা আছেন। এই যুগের প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের উপর অত্যন্ত অসহায় এবং অজ্ঞাত পরিচয় অবস্থায় খোদা তালা ওহী নাযেল করেন।

'ইয়াতীকা মিন কুল্লি ফাজজিন আমীক- ইয়ানসুরুকা রিজালুন নুহী ইলাইহি মিনাস সামাই-ওয়ালা তুসা'য়ের লি খালকিল্লাহি ওয়ালা তাসআম মিনান্নাস'

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড,পৃ: ২৬৭)

সকল পথ দিয়ে মানুষ তোমার কাছে আসবে আর এমন বিপুলহারে আসবে যে রাস্তা গর্তবহুল হয়ে পড়বে। সেই সমস্ত মানুষ তোমার সাহায্য করবে যাদের মনে আমি প্রেরণার সঞ্চার করব। কিন্তু তুমি তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেলেও তাদের প্রতি দুর্বব্যবহার করবে না।' এক গ্রামের বাসিন্দা, যার নাম সভ্যজগত কখনও শোনেনি, সে কিনা এই ঘোষণা করছে। এরপর চরম বিরোধীতা ও বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও জগতবাসী দেখল যে আমেরিকা থেকে আফ্রিকা সমস্ত এলাকা থেকে লোকেরা এখানে উপস্থিত হচ্ছে আর এত সংখ্যক মানুষের সঙ্গে করমর্দন করা, সাক্ষাত করা সাধারণ মানুষের কাজ নয়, একটি বিরাট সংখ্যক মানুষ নিজেদের প্রিয় দেশ ও ঘরবাড়ি ছেড়ে এখানে বসবাস করতে আরম্ভ করে আর কাদিয়ানের নাম সমগ্র বিশ্বে বিখ্যাত হয়ে যায়। এটি কি কোনও সাধারণ বিষয় কিম্বা এমন নিদর্শন যাকে সাধারণ দৃষ্টিতে অবহেলা করা যেতে পারে?

দ্বিতীয়ত খৃষ্টানদের মধ্য থেকে ডুই আমেরিকায় নবুয়তের দাবী করে আর নিজের এই অপবিত্র কথাবার্তা প্রকাশ করে, 'আমি খোদার কাছে দোয়া করছি, সেই দিন অচিরেই আসবে যেদিন পৃথিবী থেকে ইসলাম মুছে যাবে। হে খোদা! তুমি এমনটি কর। হে খোদা ইসলামকে ধ্বংস কর। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)ই তার বিরুদ্ধে ইশতেহার প্রকাশ করে বলেন, 'হে সেই ব্যক্তি যে নিজেকে নবী হিসেবে দাবি কর, এস আমার সঙ্গে মোবাহালা কর। আমাদের মোকাবালা দোয়ার মাধ্যমে হবে। আমরা উভয়ে খোদার কাছে দোয়া করব যে, আমাদের মাঝে যে মিথ্যাবাদী সে যেন প্রথমে ধ্বংস হয়।

(টেলিগ্রাফ, ৫ জুলাই, ১৯০৩)

কিন্তু সে দাম্ভিকতাসহকারে উত্তর দিল, তোমরা কি মনে কর, আমি সেই সব মশা-মাছির কথার উত্তর দিব, যাকে চাইলে আমি পিষে মেরে ফেলতে পারি।

(ডুই-এর পত্রিকা, ডিসেম্বর, ১৯০৩)

কিন্তু হুযুর (আ.) বলেছিলেন আর ২৩ শে আগস্ট, ১৯০৩ এর সেই ইশতেহারেই প্রকাশ করেছিলেন যে যদি ডুই মোকাবেলা থেকে পলায়ন করে, তবুই জেনে রেখো, তার সাহইয়ুন

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সুদ খাইও না যাহা (ধন-সম্পদ ও অনিষ্টকে) বহুগুণে বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার। (আলে ইমরান: ১৩১)

দোয়াপ্রার্থী: Azizur Rahaman Sb, Lalbag, Murshidabad

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট ঈসার অবস্থা আদমের অবস্থার অনুরূপ। তিনি তাহাকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। (আলে ইমরান:৬০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk Imam Hossain sb, Khundanga, Bankura

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly

BADAR

Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-10 Thursday, 25 Sep, 2025 Issue No.39

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

শহরে অচিরেই বিপদ আসতে চলেছে। হে খোদা হে কামেল খোদা! এই সিদ্ধান্ত শীঘ্রই প্রকাশ কর আর দুই -এর মিথ্যা মানুষের কাছে প্রকাশ করে দাও।' এরপর দেখুন কি হল! যে রাজপুত্রের মত জীবন অতিবাহিত করছিল, যার কাছে সাত কোটি নগদ ছিল, তার স্ত্রী এবং পুত্র তার শত্রু হয়ে যায়। তার পিতা ইশতেহার দিয়ে জানায় যে সে এক অবৈধ সন্তান। অবশেষে সে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয় আর দুঃখের ভারে উন্মাদ হয়ে যায়। অবশেষে ১৯০৭ সালের মার্চ মাসে নিজের অতৃপ্ত বাসনা ও অশেষ দুঃখ নিয়ে প্রাণ ত্যাগ করে খোদার অস্তিত্বের উপর সাক্ষ্য দান করে যায়। আর যেমনটি খোদা তাঁর প্রত্যাদিষ্ট পুরুষকে পূর্বেই সংবাদ দিয়েছিলেন আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ১৯০৭ সালের ২০ শে ফেব্রুয়ারীর ইশতেহারে প্রকাশ করেছিলেন। খোদা বলেছিলেন,

'আমি একটি জীবন্ত নিদর্শন প্রকাশ করব যাতে মহান বিজয় হবে আর তা সমগ্র বিশ্বের জন্য একটি নিদর্শন হবে।' এটি খৃষ্টান জগত, নতুন ও পুরাতন উভয় জগতের উপর হুযুর (আ.) এর বিজয় ছিল।

তৃতীয়ত এদেশে আর্যদের দাপট রয়েছে। তাদের নেতা ছিল লেখরাম। ১৩১১ হিজরির সফর মাসে প্রকাশিত কিরামাতুস সাদেকীন পুস্তিকায় এই ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ করেন যে লেখরাম সম্পর্কে খোদা তা'লা আমার দোয়া কবুল করে আমাকে জানিয়েছেন যে সে ছয় বছরের মধ্যে ধ্বংস হবে। তার অপরাধ, সে খোদার নবী (সা.) কে গালি দিত আর তাঁকে অকথ্য ভাষায় আক্রমণ করত। ১৮৯৩ সালের ২২ শে ফেব্রুয়ারীর ইশতেহারে তার মৃত্যুর দশাও বর্ণনা করে দেওয়া হয় অর্থাৎ লেখরাম নিষ্প্রাণ বাছুর যার মধ্যে কেবল একটি শব্দ আছে, কোন আধ্যাত্মিকতা নেই।

এর কারণে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে যা 'সামরী' গোবৎসকে দেওয়া হয়েছিল। সকলেই জানে যে গোবৎস সামরীকে টু করো টুকরো করা হয়েছিল, অতঃপর আগুনে পোড়ানো হয়েছিল এবং নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এরপর ১৮৯৩ সালে ২রা এপ্রিল তিনি একটি দিব্যদর্শনে দেখেন।

(বরকাতুদ দোয়া, টিকা, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-৬, পৃ: ৩৩ দ্রষ্টব্য)

একজন ভীতি-উদ্দীপক-দৃষ্টিধারী বৃহদাকৃতির মানুষ উপস্থিত হল, সে এক অদ্ভুত আকৃতির ও অদ্ভুত প্রকৃতির জীব। তাকে মানুষ মনে হল হল না বরং সাংঘাতিক কঠোর ও কঠিন ফিরিশতা বলে মনে হল। যে তাঁ কে জিজ্ঞাসা করছে, লেখরাম কোথায়? এরপর কিরামাতুস সাদেকীন এর এই পঙক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট দিনও বলে দেন। "ঈদের দ্বিতীয় দিন শনিবার।" পাঁচ বছর পূর্বে তিনি তা প্রকাশ করে নিহত হওয়ার বৃত্তান্ত বলে দেন এবং অবশেষে লেখরাম, ১৮৯৭ সালের ৬ মার্চ নিহত হয়। আর সকলে একবাক্যে স্বীকার করে নেয় যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পূর্ণ হয়ে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ সাব্যস্ত হয়েছে। অতএব ঐশী ইলহাম এমন এক জিনিস যার উপস্থিতিতে খোদাকে অস্বীকার করা অত্যন্ত ধৃষ্টতার পরিচায়ক হবে।

দশম দলিল

দশম দলিল যা প্রত্যেক বিবাদের মীমাংসার জন্য কুরআন করীম বর্ণনা করেছে তা এই আয়াত থেকে পাওয়া যায়।

যারা আমাদের বিষয়ে চেষ্টা-সাধনা করে, আমরা তাদেরকে নিজের পথ দেখাই। (আনকাবুত: ৭০)

এই আয়াতের উপর যারা অনুশীলন করেছে, তারা সব সময় লাভবান হয়েছে। যে ব্যক্তি খোদার অস্বীকারকারী, তাকে অবশ্যই স্মরণ করা উচিত যে, যদি খোদা থাকেন তবে তার জন্য খুব সমস্যা হবে। অতএব একথা চিন্তা করে যদি তার হৃদয়ে সত্য অন্বেষণের জন্য ব্যকুলতা সৃষ্টি হয়, তবে তার উচিত অনুনয় বিনয় করে এবং অনেক সাধনা করে সে যেন এমনভাবে দোয়া করে যে হে খোদা! যদি তুমি থেকে থাক আর যেভাবে তোমার মান্যকারীরা বলে তুমি অসীম শক্তিশালী, তবে তুমি আমার প্রতি কৃপা কর আর আমাকে নিজের দিকে পথপ্রদর্শন কর আর আমার মনের মধ্যেও ঈমান এবং বিশ্বাস সঞ্চার কর, যাতে আমি বঞ্চিত না থেকে যাই।' যদি এভাবে সত্য অন্তঃকরণে কোনও ব্যক্তি এই দোয়া করতে থাকে আর কমপক্ষে চল্লিশ দিন পর্যন্ত এর উপর সাধনারত থাকে, তবে সে যে ধর্মেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, যে দেশের বাসিন্দাই সে হোক না কেন, বিশ্বজগতের প্রভু অবশ্যই তাকে হিদায়ত দান করবেন। আর সে অচিরেই দেখতে পাবে, আল্লাহ্ তা'লা এমনভাবে তার উপর নিজ অস্তিত্বের প্রমাণ দিবেন যে তার মনের সংশয় ও সন্দেহের কলুষ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হবে। আর একথা তো স্পষ্ট যে, এই ধরণের সিদ্ধান্তে কোনও প্রকারের প্রতারণা হতে পারে না। অতএব সত্যান্বেষীদের জন্য এর উপর অনুশীলন করা কঠিন কিসের?

আপাতত এই দশটি দলিল দিয়েই আমি আমার নিবন্ধটি সমাপ্ত করলাম। যদিও কুরআন শরীফে আরও অনেক দলিল আছে। কিন্তু আমি আপাতত এতটুকুই যথেষ্ট মনে করছি। কেউ যদি এগুলি গভীর অভিনিবেশ সহকারে দেখে, তবে এই দলিলগুলির মধ্য থেকেই সে আরও দলিল পেয়ে যাবে। ওয়াল্লাহু মুসতাআনু।

অবশেষে সেই সব ব্যক্তিদের কাছে যাদের হাতে এই পামপ্লেট পৌঁছবে, আমি আবেদন করব, যে এটি পড়ার পর অন্য কোনও বন্ধুকে দিয়ে দিন যার জন্য তিনি এটি উপযোগী মনে করেন।

(আনোয়ারুল উলু ম, ১ম খণ্ড,পৃ: ৪১৩)

(১ম পাতার শেষাংশ...)

বিষয় অবলম্বন কর। এমন মানুষদের জন্য সব সময় একথা বিস্ময়ের হয়ে থাকে যে, রসূল বলছে বর্তমান ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে নতুন ব্যবস্থাপনা অবলম্বন কর। কাফেরদের এই দুটি কথার মধ্যে স্ববিরোধ রয়েছে। একদিকে তো তাদের মধ্যে এতটা হতাশা রয়েছে যে, তারা মনে করে, তাদের চিকিৎসার জন্য তাদের মধ্য থেকে কেউ আসতে পারেনা। অপরদিকে তারা এনিয়ে লড়াই করে যে, তাদের ব্যবস্থাপনা কেন বদলে দিচ্ছ? অধঃপতিত জাতির এমনই দশা হয়ে থাকে। তারা চায় যেন কিছু ত্যাগ করতে হয় আর না কিছু কাজ করতে হয়। এক ব্যক্তি বাইরে থেকে এসে তাদের বর্তমান ব্যবস্থাপনা বজায় রেখে তাদেরকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে। এরজন্য তাদেরকে শিক্ষা অর্জনও করতে হবে না, পরিশ্রমও করতে হবে না কিম্বা কোনও মন্দ কর্ম ত্যাগ করতে হবে না। বরং এক ব্যক্তি বাইরে থেকে এসে অন্যদেরকে মেরে ফেলবে আর সব কিছু তাদের হয়ে যাবে। তারা চিন্তা করে দেখে না যে, যদি পূর্বের ব্যবস্থাপনা সঠিক থাকত, তবে লাঞ্ছনা ও পশ্চাদপদতায় কেনই বা পড়ে থাকত? অতএব তাদের বর্তমান ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে দিয়েই পরিবর্তন সম্ভব।

"আমল দুই প্রকারের। এক, সেই আমল যা মানুষকে পুরস্কারের যোগ্য করে তোলে, আর দ্বিতীয় প্রকারের আমল সেটি যা পুরস্কার লাভের পর সেটিকে বজায় রাখার জন্য আবশ্যক হয়ে থাকে। অনেক ছাত্র ছাত্রজীবনে বেশ মেধাবী হয়ে থাকে, কিন্তু তারা যখন জীবন যুদ্ধের মধ্যে পড়ে, তখন একেবারেই অপদার্থ হিসেবে প্রতিপন্ন হয়। অনুরূপ অবস্থা যে কোনও জাতিসত্তার। কিছু জাতি বৈভব ও খ্যাতি লাভের পূর্বে খুব ভাল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে, কিন্তু ক্ষমতা লাভের পর পুণ্যের মান বজায় রাখা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত এই বাক্যটির সম্প্রসারণ করার আরও একটি কারণ হল, মানুষের কর্ম দুই প্রকারের হয়ে থাকে। এক, পুণ্যকর্ম এবং দ্বিতীয় সেই কর্ম যা উক্ত পুণ্যকর্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখে। কাজেই এই বাক্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য হল তোমাদের ব্যক্তিগত পুণ্যের কারণে আমরা তোমাকে 'খোলাফাউ ফিল আরজ' করেছিলাম। এর পর আমরা দেখতে চাইছিলাম যে, তোমরা এই কর্মধারাকে কিভাবে বজায় রাখ, যা তোমাদের পুণ্যের রক্ষক হয়। সত্য

বি আইমানিহিম বলার মাধ্যমে এ বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কর্মের প্রতিদান ঈমান অনুসারে দেওয়া হবে। অর্থাৎ বাহ্যিক আমলের ক্ষেত্রে যদিও দুজন ব্যক্তি সমান হয়, কিন্তু আমল বা কর্মের পিছনে যে নিষ্ঠা ও ভালবাসা রয়েছে, তার উপর ভিত্তি করে তাদের কর্মের প্রতিদানে তারতম্য ঘটবে। এটিও একটি অসাধারণ বিষয়। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, আবু বাকার তোমাদের থেকে সেই কারণে শ্রেষ্ঠ যা তাঁর অন্তরে রয়েছে। আমরা দেখি যে এক ব্যক্তি নামায বেশি পড়ে, রোযাও বেশি রাখে, কিন্তু অন্য কোনও ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার কৃপাকে বেশি পরিমাণে আকর্ষণ করে। এর কারণ তাদের অন্তরের অবস্থা। যে বেশি প্রকৃত পবিত্রতা ও নিষ্ঠা অর্জন করে, তার অল্প কর্ম বেশি কল্যাণ বয়ে আনে। বস্তুত সেই ব্যক্তির সমস্ত কর্মই ইবাদতে পরিণত হয়। কেননা, তার সেই সব কর্মও খোদার জন্যই হয়ে থাকে, যেগুলিকে আপাত দৃষ্টিতে জাগতিক কর্ম বলে মনে হয়, আর তার প্রতিটি গতিবিধি মানব জাতির সহানুভূতির কারণ হয়।

(তফসীর কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৪)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir